মাসিক

আত-তাহরীক

সেপ্টেম্বর-১৯৯৭

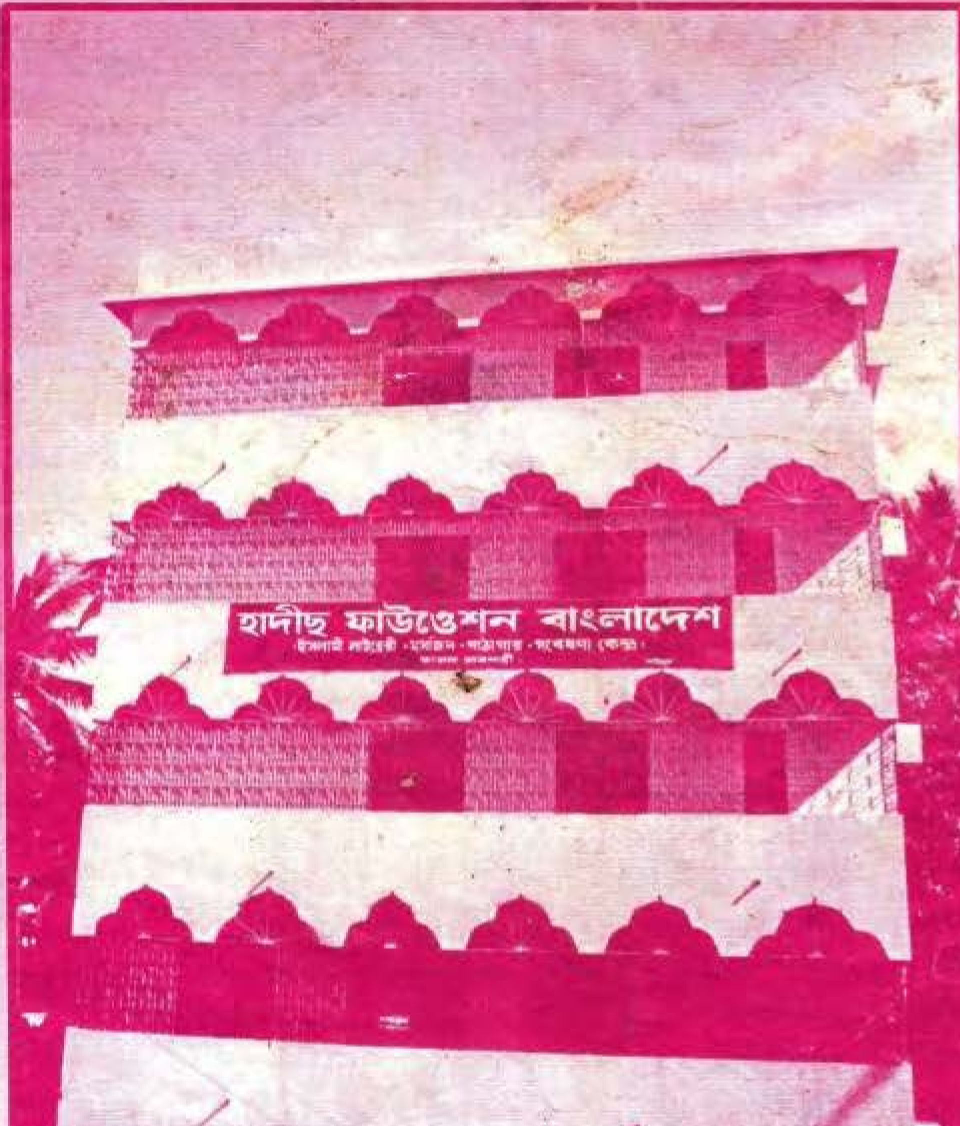

মাসিক

আত-তাহরীক

১ম বর্ষঃ ১ম সংখ্যা
জুমাদাল উলা ১৪১৮ হিঃ
ভাদ্র ১৪০৪ সাল
সেপ্টেম্বর ১৯৯৭ ইং

সম্পাদকঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউন্ডেশন কম্পিউটার্স।

যোগাযোগঃ
সম্পাদক, আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা
পোঃ সপুরা, রাজশাহী
ফোন- (০৭২১) ৭৬০৫২৫
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮
ঢাকার ঠিকানাঃ
ক-১৪৪,আরামবাগ(৪র্থ তলা), ফোন-৯৩৩৮৮৫৯
খ-১৯,ছিদ্দীক বাজার(২য় তলা, নর্থ সাউথ রোড)
গ- বাড়ী নং ৩, সড়ক নং ১১, সেক্টর ৬, উত্তরা মডেল টাউন,ঢাকা। ফোনও ফ্যাক্সঃ ৮৯৬৭৯২ ।

মূল্যঃ ১০ টাকা মাত্র।
হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সম্পাদকীয়

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম
নাহ্মাদুহূ ওয়া নুছাল্লী 'আলা রাসূলিহিল কারীম

আরবীতে 'তাহরীক' অর্থ আন্দোলন। 'আত-তাহরীক' অর্থ বিশেষ আন্দোলন। ইংরেজীতে যাকে বলা যাবে The Movement অথবা That very Movement. অতএব 'আত-তাহরীক' বিশেষ একটি আন্দোলনের লক্ষ্যে আত্ম প্রকাশ করতে যাচ্ছে। সে আন্দোলন পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক জীবন গড়ার আন্দোলন। সে আন্দোলন আল্লাহ-প্রেরিত সর্বশেষ অহি-ভিত্তিক সমাজ গড়ার আন্দোলন। সে আন্দোলন বিশ্ব মানবতার প্রকৃত মুক্তি আন্দোলন।

যে মানুষ নিজের জ্ঞানকে অহি-র জ্ঞানের সামনে বিনা দ্বিধায় সমর্পণ করে দিবে। যে মানুষ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নির্দেশকে সানন্দে মাথা পেতে নিবে। দুনিয়ার চাইতে আখেরাতকে সর্বক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিবে- 'আত-তাহরীক' তাদেরই মুখপত্র হবে।

আত-তাহরীক-এর যাত্রা শুরুতে বিশ্বপ্রভু আল্লাহ্‌র নিকটে আমাদের একান্ত প্রার্থনা তিনি যেন এর যাত্রাপথকে নিরাপদ রাখেন, তাঁর বান্দাদের অন্তরকে এর দিকে রুজু করে দেন এবং কল্যাণময় সমাজ গড়ার প্রকৃত লক্ষ্য হাছিলের পথে তাওফীক দান করেন। আমীন!

দীর্ঘ দিনের সোনালী স্বপ্ন বাস্তবায়নের রক্তিম প্রভাতে আমরা আমাদের সকল গ্রাহক, অনুগ্রাহক, লেখক, লেখিকা পাঠক- পাঠিকা ও শুভাকাংখী ভাই -বোনকে আন্তরিক সালাম ও মুবারকবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!!

সূচীপত্র

* সম্পাদকীয়
* দরসে কুরআন — পৃঃ ৩
* দরসে হাদীছ — পৃঃ ১৫
* প্রবন্ধ ঃ
  ঈমান — পৃঃ ২০
  মুসলিম ঐক্যের পূর্বশর্ত — পৃঃ ৩২
  -অধ্যক্ষ মুহাম্মাদ আব্দুস সামাদ
  আল্লামা আব্দুল্লাহ ইউসুফ আলীর শেষ জীবনের মর্মন্তুদ কাহিনী — পৃঃ ৩৪
  অনুবাদঃ আব্দুল ওয়াজেদ সালাফী
* মহিলাদের পাতাঃ
  নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ইসলাম — পৃঃ ৩৬
  -তাহেরুন নেসা
* কবিতা ঃ
  আত্-তাহরীক — পৃঃ ৩৯
  -গুমনাম রাহী
* প্রশ্নোত্তরঃ — পৃঃ ৪০

লেখকদের প্রতি আরয

১. পবিত্র কুরআন, ছহীহ হাদীছ, বিশ্বস্ত ইতিহাস ও জীবনী গ্রন্থ, হাদীছ ভিত্তিক ফিক্বহ গ্রন্থ ও আধুনিক বিজ্ঞান ইত্যাদির ভিত্তিতে লেখা উন্নত মানের ও গবেষণাধর্মী হ'তে হবে।

২. লেখায় সর্বদা তথ্যসূত্র থাকতে হবে। অর্থাৎ লেখক, বইয়ের নাম, মুদ্রণের স্থান ও তারিখ এবং অধ্যায়, খন্ড ও পৃষ্ঠা সংখ্যা উল্লেখ থাকতে হবে।

৩. সুন্দর হাতের লেখা, নির্ভুল বানান ও লাইনের মাঝে যথেষ্ট ফাঁকা রাখতে হবে। অথবা ডবল স্পেসে টাইপকৃত এবং সংক্ষিপ্ত হ'তে হবে।

৪. মহিলাদের, তরুণদের ও সোনামনিদের পাতায় প্রবন্ধ, শিক্ষামূলক ছোটগল্প, ছড়া, ছোট কবিতা, সামাজিক নাটক ইত্যাদি সানন্দে গৃহীত হবে। লেখার সাথে লেখক-এর বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পেশাসহ বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা পাঠাতে হবে।

৫. যোগ্য ও নিয়মিত লেখকদের সম্মানী ভাতা দেওয়া হবে ইনশাআল্লাহ।

***লেখা পাঠানোর ঠিকানা ঃ**

সম্পাদক,
মাসিক
আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা
পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
ফোন- (০৭২১) ৭৬০৫২৫
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮।

Contents

দরসে কুরআন

উম্মুল কুরআন

– মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

১. সূরায়ে ফাতিহা

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِيْنَ - الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ- مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ- اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ- اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ- صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ- غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَ لاَ الضَّالِّيْنَ - آمِيْنَ-

অনুবাদঃ (১) যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি জগত সমূহের প্রতিপালক (২) যিনি করুণাময় কৃপানিধান (৩) যিনি বিচার দিবসের মালিক (৪) আমরা কেবলমাত্র আপনারই ইবাদত করি এবং কেবলমাত্র আপনারই সাহায্য প্রার্থনা করি (৫) আপনি আমাদেরকে সোজা-সুদৃঢ় পথ প্রদর্শন করুন (৬) এমন ব্যক্তিদের পথ, যাহাদেরকে আপনি পুরস্কৃত করিয়াছেন (৭) তাহাদের পথ নয়, যাহারা অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট হইয়াছে।' (আমীন) আপনি ইহা কবুল করুন!!

'সূরাতুল ফাতিহাহ্' অর্থ ভূমিকার সূরা। ইহা মক্কায় অবতীর্ণ। ইহাতে ৭টি আয়াত, ২৫টি কলেমা বা শব্দ এবং ১১৩ টি হরফ বা অক্ষর রয়েছে।[১] ইহা কুরআনের মুল, কুরআনের ভূমিকা ও ছালাতের প্রতি রাক'আতে বারবার পঠিতব্য সাতটি আয়াতের সমষ্টি 'আস্-সাবউল মাছানী' নামে ছহীহ হাদীছে[২] ও পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। যেমন- আল্লাহ পাক এরশাদ করেন,

لَقَدْ اٰتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِيْ وَ الْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ

অর্থঃ 'আমি আপনাকে প্রদান করেছি বারবার পঠিতব্য সাতটি আয়াত ও মহান কুরআন'[৩]

১। তাফসীর ইবনু কাছীর (বৈরুতঃ দারুল মা'রিফাহ ২য় সংস্করণ ১৪০৮/১৯৮৮) ১ম খন্ড পৃঃ ১০।

২. যেমন হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত মরফু হাদীছে এসেছে-قال رسول الله(ص) هي ام القرآن وهي فاتحة الكتاب وهي السبع المثاني رواه ابن جرير نقله ابن كثير في تفسيره وروى الترمذي عنه عن النبي (ص) الحمد لله ام القرآن وام الكتاب والسبع المثاني وقال حديث حسن صحيح نقله القرطبي وابن كثير في تفسيرهما۔

৩.সূরায়ে হিজর ৮৭ আয়াত।

ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, ইহাকে 'উম্মুল কিতাব' এজন্য নাম রাখা হয়েছে যে, এই সূরার মাধ্যমেই পবিত্র কুরআনের সংকলন কার্য শুরু করা হয়েছে এবং এই সূরা পাঠের দ্বারা সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত পবিত্র ছালাতের সূচনা করা হয়ে থাকে।[১] 'ফাতিহাতুল কিতাব' 'উম্মুল কুরআন' আস- সাবউল মাছানী, সহ এই সূরার অনধিক ৩০টি নাম পবিত্র কুরআন ও ছহীছ হাদীছ সমূহে বর্ণিত হয়েছে। যেমন- ফাতিহাহ্, ফাতিহাতুল কিতাব, ফাতিহাতুল কুরআন, উম্মুল কিতাব, উম্মুল কুরআন, আসাসুল কুরআন, সূরাতুল হাম্‌দ, শুক্‌র, কাফিয়াহ, ওয়াফিয়াহ, আস- সাব'উল মাছানী, মিন্নাহ, দু'আ, আল-কুরআনুল আযীম, সাওয়াল, মুনাজাত, তাফভীয, মাস'আলাহ, শিফা, শা-ফিয়াহ, রুক্বিয়াহ, রা-ক্বিয়াহ, ছালাত, কান্‌য, নূর, ওয়াক্বিয়াহ, আল-হাম্‌দলিল্লাহ, ইল্‌মুল ইয়াক্বীন, সূরাতুল হাম্‌দিল উলা, সূরাতুল হাম্‌দিল কুছরা। এই ভাবে নাম বৃদ্ধির ফলে সূরায়ে ফাতিহার মর্যাদা

http://islaminonesite.wordpress.com

বৃদ্ধি পেয়েছে।[২] প্রকাশ থাকে যে, পবিত্র কুরআনের সূরা সমূহের এক বা একাধিক নামকরণ, মাক্কী ও মাদানী সূরার আগে পিছে সংযোজন ও আয়াত সমূহের বিন্যস্তকরণ- সবকিছুই 'তাওক্বীফী' অর্থাৎ আল্লাহ্‌র অহি কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট ও রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক সন্নিবেশিত যা অপরিবর্তনীয়।[৩] এর মধ্যে গূঢ় তত্ত্বসমূহ নিহিত রয়েছে।

১. তাফসীরে কুরতুবী (বৈরুতঃ দার এহ্ইয়াইত্ তুরাছিল আরাবী, ২য় সংস্করণ ১৪০৫/ ১৯৮৫) ১ম খন্ড পৃঃ ১১২।
২.আবদুস সাত্তার দেহলভী, 'তাফসীর সূরায়ে ফাতিহা' (করাচীঃ মাকতাবা আইয়ূবিয়াহ, ৪র্থ সংস্করণ) ১৩৮৫/১৯৬৫) পৃঃ ৬৮-৯২ গৃহীতঃ 'খাযীনাতুল আসরার' 'আল-ইতক্বান' ও 'আদ-দীনুল খালিছ'।
৩. তাফসীরে কুরতুবী ১/৬০পৃঃ।

২. অবতরণকালঃ

সর্বপ্রথম সূরায়ে আলাক্ব-এর প্রথম পাঁচটি আয়াত মক্কায় নাযিল হয়।[১] তার পর দীর্ঘ তিন বা আড়াই বছর যাবৎ আর কোন আয়াত নাযিল হয়নি।[২] অতঃপর সূরায়ে মুদ্দাছ্ছির-এর প্রথম ৭টি আয়াত নাযিল হয়।[৩] তারপরে সর্বপ্রথম পূর্ণাংগ সূরা হিসাবে সূরায়ে ফাতিহা নাযিল হয়।[৪]

৩. বিষয়বস্তুঃ

সূরায়ে ফাতিহার মূ'ল বিষয়বস্তু হ'ল দো'আ বা প্রার্থনা। একারণে এই সূরার অন্যতম নাম হ'ল 'সূরাতুদ দু'আ'। রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, أَفْضَلُ الذِّكْرِ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَ أَفْضَلُ الدُّعَاءِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ। অর্থাৎ 'শ্রেষ্ঠ যিক্‌র হ'ল লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং শ্রেষ্ঠ দো'আ হ'ল 'আল-হামদুলিল্লাহ' বা সূরায়ে ফাতিহা'(তিরমিযী-হাসান, মিশকাত হা/২৩০৬)। এর দ্বারা একথাই বুঝানো হচ্ছে যে, মহাগ্রন্থ আল-- কুরআন হ'তে ফায়েদা পেতে গেলে তাকে অবশ্যই উক্ত নিয়তে আল্লাহ্‌র নিকটে প্রার্থনা নিবেদন করতে হবে। এই সূরাতে বর্ণিত মূল দো'আ হ'ল ৫ম আয়াত إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ। 'আপনি আমাদেরকে সোজা-সুদৃঢ় পথ প্রদর্শন করুন'! বলা যেতে পারে যে, সমস্ত কুরআনই উক্ত প্রার্থনার বিস্তারিত জওয়াব।

৪. দো'আর আদব ঃ

অত্র সূরাতে দো'আ করার আদব শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। ১ম হ'তে ৩য় আয়াত পর্যন্ত যার নিকটে প্রার্থনা করা হবে, সেই মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র প্রশংসা করা হয়েছে। অতঃপর ৪র্থ আয়াতে তাঁর প্রতি চরম আনুগত্য প্রদর্শন করা হয়েছে ও কেবলমাত্র তাঁর নিকট থেকেই সাহায্য কামনার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। অতঃপর ৫ম আয়াতে মূল দো'আর বিষয়বস্তু ছিরাতে মুস্তাকীম-এর হেদায়াত চাওয়া হয়েছে। ৬ষ্ঠ ও ৭ম আয়াতদদ্বয় মূলতঃ ৫ম আয়াতের ব্যাখ্যা হিসাবে এসেছে। এই ভাবে প্রার্থনা নিবেদন শেষে 'আমীন' বলে উহা কবুল করার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আল্লাহ্‌র নিকটে দো'আ করতে বলেছেন। মোট কথা প্রথমে প্রশংসা ও আনুগত্য নিবেদন করার পরে দো'আ পেশ করা হয়েছে। আল্লাহ্‌র জন্য হাম্‌দ ও রাসূলের জন্য দরূদ পেশ করার পরে

১. তাফসীরে ইবনে কাছীর ৪/৫৬৪ পৃঃ।
২. মুবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতুম (রিয়াযঃ মাকতাবা দারুস সালাম ১৪১৪/১৯৯৪) পৃঃ ৬৯
৩. তাফসীরে ইবনে কাছীর ৪/৪৭০ গৃহীতঃ ত্বাবারাণী।
৪. তাফসীরে কুরতুবী ১/১১৬ গৃহীতঃ বায়হাক্বী, মুসলিম।

দো'আ করা হ'ল দো'আর সুন্নাতী তরীকা(আবু, তির, মিশকাত হা/৯৩০,৯৩১)।

এই সূরাতে 'ছিরাতে মুস্তাকীম'এর হেদায়াত প্রার্থনা করা হয়েছে। আর এই হেদায়াত পাওয়ার উপরেই বান্দার ইহকালীন মঙ্গল ও পরকালীন মুক্তি নির্ভর করছে।সম্ভবতঃ একারণেই ছালাতের প্রতি রাক'আতের শুরুতে ইমাম ও মুক্তাদী সকল মুছল্লীর জন্য এই সূরা পাঠ করা ফরয করা হয়েছে। যেমন ছহীহ হাদীছে এসেছে, لا صلوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب অর্থাৎ 'ঐ ব্যক্তির ছালাত সিদ্ধ নয়, যে ব্যক্তি সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করেনি' (বুঃ মুঃ মিশকাত হা/ ৮২২)। সম্ভবতঃ একারণেই সূরায়ে ফাতিহার অন্যতম নাম হ'ল 'ছালাত'। অর্থাৎ যা ব্যতীত 'ছালাত' সিদ্ধ হয়না।

৫. ফাযায়েলঃ

(১) এই সূরা কুরআনের সর্বাধিক মর্যাদামন্ডিত সূরা। তাওরাত, যবুর, ইনজীল, কুরআন কোন কিতাবে এই সূরার তুলনীয় কোন সূরা নেই(আহমাদ, বুখারী প্রভৃতি, তির, মিশ হা/ ২১৪২)।

(২) এই সূরা এবং সূরায়ে বাক্বারাহ্‌র শেষ তিনটি আয়াত হ'ল আল্লাহ্‌র পক্ষ হ'তে প্রেরিত বিশেষ নূর, যা ইতিপূর্বে কোন নবীকে দেওয়া হয়নি (মুসলিম, নাসাঈ)। (৩) যে ব্যক্তি ছালাতের মধ্যে সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করল না, তার ছালাত ত্রুটিপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ রইল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এই কথাটি তিনবার বলেন। রাবী হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, যখন আমরা ইমামের পিছনে থাকি ....? জওয়াবে তিনি বললেন, 'اِقْرَأْ بِهَا فِيْ نَفْسِكَ' 'তুমি মনে মনে পড়'। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ বলেনঃ قَسَمْتُ الصَّلاَةَ بَيْنِي وَ بَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ'ছালাতকে অর্থাৎ সূরায়ে ফাতিহাকে আমি আমার ও আমার বান্দার মধ্যে দু'ভাগে ভাগ করেছি। আর আমার বান্দা যা চাইবে তাই পাবে। যখন সে বলবে 'আলহামদুলিল্লাহি....' তখন আল্লাহ বলেন, حَمِدَنِي عَبْدِي 'আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে।' যখন সে বলে, 'আর রহমানির রাহীম' তখন আল্লাহ বলেন, أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي 'আমার বান্দা আমার গুণ বর্ণনা করেছে।' যখন সে বলে, 'মা-লিকি.........' তখন আল্লাহ বলেন, مَجَّدَنِي عَبْدِي ' বান্দা আমার মর্যাদা বর্ণনা করেছে।' অন্য রেওয়ায়াতে 'বান্দা আমার নিকটে নিজেকেসমর্পণ করেছে'। যখন সে বলে 'ইইয়াকা না'বুদু.......তখন আল্লাহ বলেন, هَذَا بَيْنِي وَ بَيْنَ عَبْدِي وَ لِعَبْدِي مَا سَأَلَ 'এটি আমার ও আমার বান্দার মধ্যে বিভক্ত। আমার বান্দা যা চাইবে, তাই পাবে'। অতঃপর যখন সে বলে, ' ইহ্‌দিনাছ ছিরাত্বাল ...... ওয়া লায্ যা-ল্লীন' তখন আল্লাহ বলেন , هَذَا لِعَبْدِي وَ لِعَبْدِي مَا سَأَلَ 'এটি সম্পূর্ণ বান্দার জন্য। আর বান্দা যা চাইবে, তাই পাবে' (মুসলিম, নাসাঈ, মিশ হা/ ৮২৩)।

(৪) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, একদা এক সফরে আমাদের এক সাথী জনৈক গোত্রপতিকে শুধুমাত্র সূরায়ে ফাতিহা পড়ে ফুঁক দিয়ে সাপের বিষ ঝাড়েন ও তিনি সুস্থ হন..... (বুখারী)। এজন্য এ সূরাকে 'সূরায়ে শিফা' বলা হয়েছে।[১]

(৫) ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আল-কুরতুবী (মৃঃ ৬৭১ হিঃ) বলেন, সূরায়ে ফাতিহাতে যে সকল ছিফাত রয়েছে, তা অন্য কোথাও নেই। এমনকি একেই 'আল-কুরআনুল আযীম' বা মহান কুরআন বলা হয়েছে (হিজর

৮৭)। এই সূরার ২৫টি কলেমা কুরআনের যাবতীয় ইল্‌মকে শামিল করে। এই সূরার বিশেষ মর্যাদা এই যে, আল্লাহ এটিকে নিজের ও নিজের বান্দার মধ্যে ভাগ করে নিয়েছেন। একে বাদ দিয়ে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করা সম্ভব নয়। সেজন্যই একে 'উম্মুল কুরআন' বলা হয়েছে। পবিত্র কুরআন মূলতঃ তিনটি বিষয়ে বিভক্ত। তাওহীদ, আহকাম ও নছীহত। সূরায়ে ইখলাছে তাওহীদ পূর্ণাঙ্গভাবে থাকার কারণে তা কুরআনের এক তৃতীয়াংশের মর্যাদা পেয়েছে। কিন্তু সূরায়ে ফাতিহাতে তিনটি বিষয় থাকার কারণে তা কুরআনের মূল বা উম্মুল কুরআন হওয়ার মহত্তম মর্যাদা লাভে ধন্য হয়েছে।[২]

১.তাফসীরে ইবনে কাছীর ১/১১-১২ পৃঃ; কুরতুবী ১/৯৪,১০৮।

২. কুরতুবী ১/১১০-১১।

৬. সংক্ষিপ্ত তাফসীরঃ

কুরআন পাঠের শুরুতে শয়তানের ধোকা হ'তে আল্লাহ্‌র নিকটে পানাহ চেয়ে 'আঊযুবিল্লাহ.....'পাঠ করা, অতঃপর আল্লাহ্‌র নামে ক্বিরাআত শুরু করার সংকল্প ব্যক্ত করে 'বিস্‌মিল্লাহ.....' পাঠ করা সুন্নাত। তবে ছালাতের শুরুতে কেবল ১ম রাক'আতে সূরায়ে ফাতিহা পাঠের পূর্বে 'আঊযুবিল্লাহ......' চুপে চুপে পাঠ করবে।[১] অনুরূপভাবে জেহরী ছালাতে 'বিসমিল্লাহ....' চুপে চুপে পড়ার দলীল অধিকতর স্পষ্ট ও মযবুত।[২] তবে যে সকল বিদ্বান বিসমিল্লাহ-কে সূরায়ে ফাতিহার অন্যতম আয়াত মনে করেন, তাঁরা জেহরী ছালাতে অন্য আয়াতের ন্যায় এটিকেও জোরে পড়ার পক্ষে মত প্রকাশ করেন।[৩] মূলতঃ 'বিসমিল্লহির রহমানির রহীম' মক্কায় অবতীর্ণ সূরায়ে নমল-এর ৩০ নং আয়াতের অংশ, যা সাবা-র রাণী বিলক্বীস-এর নিকটে লিখিত পত্রের শুরুতে হযরত সুলায়মান (আঃ) লিখেছিলেন।[৪] এই আয়াত নাযিলের পূর্বে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) কখনো 'বিসমিল্লাহ' লিখতেন না। কুরআন শরীফের বিভিন্ন সূরার মধ্যে পার্থক্য বুঝানোর জন্য সূরায়ে তওবা ব্যতীত অন্য সকল সূরার প্রথমে ' বিসমিল্লাহ' লিখিত হয়। অমনিভাবে বই ও চিঠি পত্রের শুরুতে বরকত হাছিলের উদ্দেশ্যে 'বিসমিল্লাহ' লেখা সম্পর্কে উম্মতের ঐক্যমত রয়েছে।[৫]

১. শাওকানী, নায়লুল আওত্বার (ক্বায়রোঃ দারুশ শাবাব, ১৩৯৮/১৯৭৮) ৩/৩৬-৩৯; সাইয়িদ সাবিক্ব, ফিকহুস সুন্নাহ (ক্বায়রোঃ দারুল ফাত্‌হ, ৫ম সংস্করণ ১৪১২/১৯৯২) ১/১১২; তাফসীরে কুরতুবী ১/৮৬।

২. নায়নুল আওত্বার ৩/৪৬,৫২; কুরতুবী ১/৯৪।

৩. নায়েল ৩/৪৩-৪৫

৪. নামাল ২৯-৩০ (قَالَتْ يَاأَيُّهَا الْمَلَؤُا إِنِّيْ أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيْمٌ ، إِنَّه مِنْ سُلَيْمَانَ وَ إِنَّه بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ)

৫. কুরতুবী ১/৯৫,৯৭।

বিভিন্ন হাদীছে নেকীর কাজের শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলার নির্দেশ এসেছে। সেকারণ সকল নেকীর কাজ ও কথার শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা 'মুস্তাহাব'(তাফসীর ইবনে কাছীর ১/১৯)। এখানে 'বিসমিল্লাহ' অর্থ 'বিল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সাহায্য ও তাওফীক নিয়ে আমি শুরু করছি। اسم বা নাম কথাটি বৃদ্ধি করা হয়েছে আল্লাহর মর্যাদা আরও সমুন্নত করার জন্য এবং যাতে 'বিল্লাহ' শব্দ দ্বারা

http://islaminonesite.wordpress.com

কসম বা শপথ না বুঝায়, সেজন্য। অধিক ব্যবহারের কারণে باسم. থেকে আলিফ বিলুপ্ত করে بسم করা হয়েছে। إقرأ باسم ربك তে আলিফ মওজুদ আছে অপেক্ষাকৃত কম ব্যবহারের কারণে।

الله। হ'ল নাম বা 'এসমে আযম।' আল্লাহ্‌র সকল ছিফাতী নাম এই যাতী নামের অনুসারী। আল্লাহ ব্যতীত এই নাম অন্য কারু জন্য প্রযোজ্য নয়। এর কোন দ্বিবচন বা বহুবচন নেই। উলূহিয়াতের সকল গুণাবলীর ধারক হলেন আল্লাহ। তিনিই একমাত্র মা'বুদ। তিনি চিরঞ্জীব ও চিরজাগ্রত। অধিকাংশের মতে 'আল্লাহ' শব্দটি 'মুশতাক' وَلَهَ يَلِهُ إِلاهٌ فهو مَالُوْهٌ অর্থাৎ হয়রান ও নিরাশ হয়ে যে সর্বোচ্চ সত্তার নিকটে আশ্রয় চাওয়া হয় তিনিই مَالُوه বা আল্লাহ।

رَحْمنٌ দ্বারা রহম বা অনুগ্রহের আধিক্য বুঝানো হয়েছে। এটি আল্লাহর জন্য খাছ। এই বিশেষণ অন্যের জন্য সিদ্ধ নয়।

رحيم আল্লাহ ও বান্দা সবার জন্য বিশেষণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন রাসূলের (ছাঃ) ছিফাত হিসাবে পবিত্র কুরআনে رءوف رحيم শব্দ দু'টি ব্যবহৃত হয়েছে।

দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের ব্যাপকতা বুঝানোর জন্য দু'টো একই গুণবাচক শব্দকে একত্রে ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা আল্লাহ্‌র রহমত তাঁর ক্রোধকে পরাভূত করেছে (বুঃমুঃ মিশ/ ২৩৬৪) এবং তাঁর রহমত সকল কিছুতেই ব্যপ্ত রয়েছে (আ'রাফ-১৫৬ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْئٍ - إن رحمتي سبقت غضبي، متفق عليه)।

বিভিন্ন শুভ কাজের শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলা সুন্নাত। এ বিষয়ে বহু হাদীছ এসেছে। 'বিসমিল্লাহ' হ'ল শয়তান, দুষ্ট জিন ও মানুষের মধ্যকার পর্দা স্বরূপ'-(দারাকুৎনী)। গৃহে প্রবেশ ও বের হওয়া, বাড়ীর দরজা বন্ধ করা, বাতি নেভানো, পাত্র ঢাকা, বোতলের মুখ লাগানো, চুক্তিনামা স্বাক্ষর, ওযু- গোসল, খানা-পিনা, যবহ ইত্যাদি সকল শুভ কাজের শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলার জন্য হাদীছে স্পষ্ট ভাবে নির্দেশ এসেছে। শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলতে ভুলে গেলে শেষে بِسْمِ اللّه أَوَّلَه وَآخِرَه। বলতে হবে (তির, আবু,মিশ হা/৪২০২)। উছমান বিন আবুল 'আছ ইসলাম গ্রহণের পর থেকে ব্যথার অসুখে আক্রান্ত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁকে ব্যাথার স্থানে হাত রেখে তিনবার 'বিসমিল্লাহ' বলতে ও সাত বার أَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِه مِنْ شَرِّمَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ পাঠ করতে আদেশ দিলেন'(কুরতুবী ১/৯৮)।

সকল শুভ কাজের শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলার মধ্যে তাক্বদীরকে অস্বীকার কারী ভ্রান্ত ফিরকা 'ক্বাদারিয়া' ও তাদের অনুসারীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ রয়েছে। কেননা তাদের ধারণা মতে বান্দার কাজ তার নিজ ইচ্ছাধীন। এখানে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার কোন প্রতিফলন নেই। অথচ আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে সকল কাজের শুরুতে আল্লাহর সাহায্য ও তাওফীক কামনার নির্দেশ দান করেছেন। কেননা আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত বান্দার কোন ইচ্ছাই পুরণ হ'তে পারেনা। তিনিই কর্মের স্রষ্টা ও বান্দা কর্মের বাস্তবায়নকারী মাত্র। তাছাড়া শুধুমাত্র আমল কাউকে জান্নাতে নিয়ে যেতে পারবেনা, যদি না আল্লাহ্‌র রহমত থাকে। কেননা রাসূলুল্লাহ এরশাদ করেন, لايُدْخِلُ احدا منكم عمله الجنةَ و لا يُجِيْرُه من النار و لا إِنا إلا برحمة الله رواه مسلم عن جابر 'কারু আমল তাকে জান্নাতে

প্রবেশ করাবেনা কিংবা জাহান্নাম থেকে রেহাই দেবেনা, এমনকি আমাকেও নয়, আল্লাহ্র রহমত ব্যতীত' (সুবহানাল্লাহ) মুস, মিশ হা/২৩৭২। বলা বাহুল্য 'বিসমিল্লাহ' পাঠের দ্বারা মূলতঃ আল্লাহ্র রহমত ও অনুগ্রহ কামনা করা হয়। আহলে সুন্নাত আহলেহাদীছের আকীদা হ'ল এটাই।

(খ) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ - ال অর্থ ' যাবতীয়' حَمْدٌ 'প্রশংসা, لله 'আল্লাহ্র জন্য' رب العالمين 'জগতসমূহের প্রতিপালক'। রঈসুল মুফাস্সিরীন হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) الحمدلله এর অর্থ করেছেন الشكر لله অর্থাৎ সকল কৃতজ্ঞতা আল্লাহ্র জন্য। ইমাম ইবনু জারীর তাবারী (মৃঃ ৩১০ হিঃ) ও অনুরূপ অর্থ ব্যক্ত করেছেন। যদিও 'হাম্দ' অর্থ মৌখিক প্রশংসা এবং 'শুক্র' অর্থ কোন কিছুর বিনিময়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। কিন্তু الحمدلله দু'টিকেই শামিল করে। ال এখানে استغراق বা সামগ্রিক অর্থে এসেছে। যা সকল প্রকারের প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতাকে শামিল করে এবং الثناء الكامل বা পূর্ণাংগ প্রশংসা অর্থ প্রকাশ করে।

আমাদের প্রভু আমাদেরকে যে অগনিত নেয়ামত দান করেছেন, তার বিনিময়ে পূর্ণ কৃতজ্ঞতাসহ যাবতীয় প্রশংসা নিবেদন করাই ইহার উদ্দেশ্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন যে,'শ্রেষ্ঠ যিকর হ'ল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ও শ্রেষ্ঠ দো'আ হ'ল 'আল-হামদুল্লিাহ' (তিরমিযী, মিশ হা/ ২৩০৬)। অন্য বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যদি আমার উম্মতের কারু হাতে পুরো দুনিয়ার সবকিছু সম্পদ এনে দেওয়া হয়, অতঃপর সে 'আল-হামদুল্লিাহ' বলে, তবে আল-হামদুলিল্লাহ সবকিছুর চাইতে উত্তম হবে'(কুরতুবী ১/১৩৩)। কেননা সকল নেয়ামত ধ্বংসশীল কিন্তু আল্লাহ্র কলেমা চিরস্থায়ী।

رَبٌّ الْعَالَمِيْنَ। 'রব' অর্থ প্রতিপালক, প্রভু, মনিব ইত্যাদি। আল্লাহ্র সকল গুণের মধ্যে প্রতিপালকের গুণই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। কেননা সৃষ্টিকর্তা হিসাবে তাঁকে প্রায় সকল মানুষ স্বীকার করলেও প্রতিপালক হিসাবে অনেকে স্বীকার করতে চায় না। তাই মুমিন হওয়ার আবশ্যিক শর্ত হ'ল আল্লাহকে 'রব' হিসাবে স্বীকার করা, শুধুমাত্র 'খালেক' বা সৃষ্টিকর্তা হিসাবে নয়। رَبٌّ বা الرَّبُّ। বললে কেবলমাত্র আল্লাহকে বুঝাবে। অন্যের জন্য এই বিশেষণ প্রয়োগ করা নিষিদ্ধ। তবে অন্যকিছুর দিকে সম্বন্ধ করলে সিদ্ধ হবে। যেমন – ربّ هذا البيت। 'এই গৃহের মালিক' ইত্যাদি।

عَالَمِيْنَ – عَالَم শব্দের বহুবচন। উহা দ্বারা আল্লাহ ব্যতীত সকল অস্তিত্বশীল বস্তুকে বুঝানো হয়। عَالَم নিজেই বহুবচন। এর কোন একবচন নেই। عالين বহু বচনের বহুবচন। এর দ্বারা মানুষের জানা-অজানা সকল সৃষ্টি জগতকে বুঝানো হয়েছে। হযরত ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ (রাঃ) বলেন, আল্লাহ পাকের ১৮০০০ হাযার মাখলুকাত রয়েছে। পৃথিবী তার মধ্যে একটি। হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বলেন ' আল্লাহ্ আসমান ও যমীন এবং এ দুইয়ের মধ্যকার ও মধ্যবতী আমাদের জানা ও অজানা অগণিত জগতের প্রভু ও প্রতিপালক' (ইবনু কাছীর ১/২৫)। ' আধুনিক মহাকাশ গবেষণা যতই এগিয়ে যাচ্ছে, ততই আমাদের নিকটে সৌরজগতের নতুন নতুন বিস্ময়ের দুয়ার খুলে যাচ্ছে ও সূরায়ে ফাতিহার এই ভবিষ্যদ্বাণী কার্যকর

হচ্ছে এবং আল্লাহ পাকের রবূবিয়াতের ব্যাপকতার ধারণা মুসলিম-অমুসলিম সকলের মধ্যে ক্রমেই দৃঢ় হ'তে দৃঢ়তর হচ্ছে। ফালিল্লা-হিল হাম্‌দ। অত্র আয়াতে আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও তাঁর একক প্রতিপালক হওয়ার মধ্য দিয়ে তাঁর একত্ববাদ বা তাওহীদ সুন্দর ভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

الرحمن الرحيم। 'রহমান ও রহীম' এর আলোচনা বিসমিল্লাহ্‌র ব্যাখ্যায় ইতিপূর্বে করা হয়েছে। ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, পূর্বের আয়াতে 'রাব্বুল আলামীন' বলে আল্লাহ যে 'তারহীব' বা ভীতকর বিশেষণ প্রয়োগ করেছেন, পরবর্তী আয়াতে রহমান ও রহীম বলে স্বীয় 'দয়া' গুণের প্রকাশ ঘটিয়ে উভয় গুণের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছেন ও মুমিনকে আল্লাহ্‌র রহমত হ'তে নিরাশ না হওয়ার জন্য 'তারগীব' বা উৎসাহ দান করেছেন। যেমন তারগীব ও তারহীব তিনি একই স্থানে ব্যক্ত করেছেন সূরায়ে হিজ্‌র ৪৫-৫৯ আয়াতে ও সূরায়ে মুমিন ৩ আয়াতে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,'যদি মুমিন ব্যক্তি জানতো আল্লাহ্‌র নিকটে কত কঠোরতম শাস্তি রয়েছে, তাহলে কেউই জান্নাতের আকাংখী হ'তনা। অনুরূপভাবে যদি কোন কাফির জান্‌তো আল্লাহ্‌র নিকটে কি অগাধ অনুগ্রহ রয়েছে, তাহলে কেউই জান্নাত হ'তে নিরাশ হ'ত না'(মুসলিম)।

مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ স্বীয় বান্দাদেরকে একথা বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, সৃষ্টি জগতের আদি হ'তে অন্ত পর্যন্ত সকল কিছুর চিরন্তন মালিকানা তাঁর হাতে। শাসক যেমন অধীনস্তদেরকে সাময়িক কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োগ করেন ও তাদেরকে শাসকের নিকটে দায়বদ্ধ থাকতে হয়, অমনিভাবে দুনিয়ার ক্ষনস্থায়ী জীবনে বান্দাকে তিনি বিশ্বপরিচালনার বিভিন্ন পর্যায়ে সাময়িকভাবে দায়িত্ব প্রদান করেছেন। বান্দার কর্মজীবনের ছোটবড় সবকিছুই আল্লাহ্‌র গোচরে রয়েছে এবং কেয়ামতের দিন সবকিছুর চুড়ান্ত হিসাব তিনি গ্রহণ করবেন ও সে অনুযায়ী জাহান্নামের শাস্তি অথবা জান্নাতের পুরস্কার দান করবেন। তিনি ইচ্ছা করলে কোন বান্দাকে বিনা হিসাবেও জান্নাতে দিতে পারেন। মোটকথা বিচার দিবসের পূর্ণ মালিকানা ও একচ্ছত্র অধিকার কেবলমাত্র তাঁরই হাতে। তাঁর অনুমতি ব্যতীত কেউ তাঁর নিকটে সুপারিশ করতে পারবেনা। তাঁর অনুগ্রহ ব্যতীত কেউ জান্নাতে যেতে পারবেনা। الدين এর অনেকগুলি অর্থ রয়েছে। যেমন প্রতিদান, হিসাব, ফায়ছালা, আনুগত্য, রীতি, আচরণ ইত্যাদি। এখানে يوم الدين এর অর্থ হ'ল يوم الجزاء অর্থাৎ প্রতিদান বা হিসাব-নিকাশের দিন।

মানুষের দুনিয়াবী জীবনের যাবতীয় আমলের হিসাব ও তার প্রতিদান ঐদিন আল্লাহ তাঁর বান্দাকে প্রদান করবেন। ২য় আয়াতে নিজেকে 'করুণাময় ও কৃপানিধান' ঘোষণা করার পরেই নিজেকে বিচার দিবস-এর মালিক ঘোষণা করে আল্লাহ পাক এটাই বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, যালেম ও পাপী নির্বিশেষে সবাইকে ক্ষমা করার মধ্যে প্রকৃত করুণা নিহিত নেই। বরং বিশ্ব সৃষ্টির প্রতি সত্যিকারের করুণা নিহিত রয়েছে কেবলমাত্র ন্যায় বিচারের মধ্যে। অতএব সকলে যেন চুড়ান্ত হিসাব দানের পূর্বে নিজ নিজ কর্মকে সুন্দর করে নেয়। কেননা সামান্যতম নেকী ও বদীর হিসাব ঐদিন নেওয়া হবে এবং সকলকে যথাযথভাবে প্রতিদান দেওয়া হবে। যেদিকে ইংগিত করে আল্লাহ বলেন, يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللّٰهُ دِيْنَهُمُ الْحَقَّ 'যেদিন আল্লাহ

তাদেরকে তাদের যথার্থ প্রতিদান পরিপূর্ণভাবে দান করবেন' (নূর ২৫)। হাদীছে এসেছে 'প্রকৃত জ্ঞানী সেই যে নিজেকে অনুগত রাখে ও মৃত্যুর পরের জীবনের জন্য আমল করে'। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا ....'হিসাব দেওয়ার পূর্বে তোমরা স্ব স্ব আমলের হিসাব নাও। তোমার আমল ওযন হওয়ার পূর্বে স্ব স্ব আমলের ওযন কর। তোমার কোন আমল যার কাছে গোপন নেই তাঁর নিকটে চূড়ান্তভাবে আমল পেশ হওয়ার পূর্বেই প্রস্তুতি গ্রহণ কর'(ইবনু কাছীর ১/২৭)। যেমন আল্লাহ পাক এরশাদ করেন- সেই দিন তোমাদেরকে উপস্থিত করা হবে, যেদিন তোমাদের কোন গোপন বিষয় গোপন থাকবে না, (আল-হাক্কাহ ১৮)।

(ضمير منصوب منفصل) ايّاك - ايّاك نعبد وايّاك نستعين
'আপনাকেই' نعبد 'আমরা ইবাদত করি'। نستعين 'আমরা সাহায্য প্রার্থনা করি'। অর্থাৎ আমরা আপনাকে ইবাদতের জন্য এবং সাহায্য প্রার্থনার জন্য খাছ করছি। আপনি ব্যতীত অন্য কারু ইবাদত করি না এবং অন্য কারো নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিনা। চরম আনুগত্য ও প্রণতিকে ইবাদত বা উপাসনা বলা হয়। শারঈ পরিভাষায় আল্লাহ্‌র আদেশ পালন ও নিষেধ বর্জনের মাধ্যমে তাঁর প্রতি একনিষ্ঠ ভালোবাসা, ভীতি ও আনুগত্যকে ইবাদত বলা হয়। হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বলেন, আয়াতের অর্থ إِيَّاكَ نُوَحِّدُ 'আমরা আপনারই একত্ববাদ ঘোষণা করি,' আপনাকেই মাত্র ভয় করি এবং আপনার আনুগত্য করার জন্যই আপনার সাহায্য কামনা করি।

' আপনাকে ইবাদত করি' একথাটুকু বুঝানোর জন্য نَعْبُدُكَ বলাই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু ك কর্মপদের সর্বনামকে নিয়মমাফিক نعبد ক্রিয়ার পরে না বসিয়ে পূর্বে বসানোর মূল কারণ হ'ল বক্তব্যের মধ্যে Emphasis বা জোর সৃষ্টি করা। কেননা 'আপনাকে ইবাদত করি' বললে অন্যকেও ইবাদত করার সম্ভাবনা বাকী থাকে। কিন্তু 'কেবলমাত্র আপনাকেই ইবাদত করি' বললে সে সম্ভাবনা বাতিল হয়ে যায়। إيّاك যমীরকে একই বাক্যে দু'বার অগ্রে বসানোর পিছনেও উদ্দেশ্য হ'ল একথা জোর দিয়ে বলা যে, আমাদের যাবতীয় ইবাদত ও ইস্তি'আনাত এবং উপাসনা ও সাহায্য প্রার্থনাকে আমরা কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য খাছ করছি। অন্য কারু জন্য আমাদের হৃদয়ে কোন স্থান নেই।

বিগত যুগের জনৈক বিদ্বান বলেন, সমস্ত কুরআনের মুল নিহিত আছে সূরায়ে ফাতিহার মধ্যে এবং সূরায়ে ফাতিহার মূল নিহিত আছে এই আয়াতটির মধ্যে। এর প্রথম অংশে শিরক হ'তে মুক্তি ঘোষণা করা হয়েছে ও দ্বিতীয় অংশে আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা করে কেবল তাঁর উপরেই ভরসা করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত ১ম তিনটি আয়াতে নাম পুরুষ বা صيغه غائب ব্যবহার করে অত্র আয়াতে মধ্যম পুরুষ বা صيغه حاضر ব্যবহার করে সরাসরি আল্লাহকে সম্বোধন করার মধ্যে তাঁর অধিকতর নিকটে পৌঁছে যাওয়ার ইংগিত প্রদান করা হয়েছে। প্রেমাস্পদের নিকটে ভক্ত প্রেমিক তার ব্যাকুল হৃদয়ের আকুল বাসনা সরাসরি নিবেদন করবে এটাই তো কাম্য। অত্র আয়াতের এই আলংকরিক দ্যোতনা মুমিন হৃদয়ে ভালোবাসার ঢেউ তোলে। হাদীছে এসেছে,- আল্লাহ বলেন যে, এই আয়াতের অর্ধেক আমার জন্য ও অর্ধেক বান্দার জন্য। আর আমার বান্দা যা চাইবে, তাই পাবে (বুঃমুঃ)। এর মাধ্যে একটি বিষয়ে আশার সঞ্চার হয় যে, নিয়ত ও ইবাদত

নিখাদ হ'লে আল্লাহ্র সাহায্য অবশ্যম্ভাবী। ইবাদত ত্রুটিপূর্ণ হ'লে এবং খুলুছিয়াতের অভাব থাক্লে বান্দার কামনা ও বাসনা পূরণ না-ও হতে পারে। সাহায্য চাওয়ার পূর্বে ইবাদত- এর বিষয় উল্লেখ করার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য এটাই।

'ইস্তি'আনাত' বা সাহায্য চাওয়া ঐসকল বিষয়ে যা মাখলুকের ক্ষমতার অর্ন্তভুক্ত, সেই সকল বিষয়ে মানুষ পরস্পরের নিকটে সাহায্য কামনা করবে এটা কোন দোষের কাজ নয়। বরং প্রত্যেক নেকীর কাজে সাহায্য করার জন্য শরীয়তে স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, تعاونوا على البرّ والتقوى 'তোমরা নেকী ও তাক্ওয়ার কাজে পরস্পরকে সাহায্য কর' (মায়েদাহ ২)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন والله في عون العبد ماكان العبد في عون اخيه। 'আল্লাহ তার বান্দার সাহায্যে অতক্ষন থাকেন, যতক্ষন বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে থাকে' (মুসলিম মিশ, হা /২০৪ ইল্ম অধ্যায়)। এগুলি হ'ল বৈধ ইস্তি'আনাত।

এক্ষণে নিষিদ্ধ ইস্তে'আনাত হ'ল যে সকল বিষয়ে মাখলুকের কোন ক্ষমতা নেই, সেই সকল বিষয়ে মাখলুকের নিকটে সাহায্য চাওয়া। এটি অবৈধ এবং প্রকাশ্য শিরকের অন্তর্ভুক্ত। যেমন মৃত মানুষের নিকটে সাহায্য চাওয়া, তার অসীলায় মুক্তি কামনা করা, তার আশ্রয় ভিক্ষা করা ইত্যাদি। আল্লাহ বলেন, وما انت بمسمع من في القبور। 'আপনি কোন কবরবাসীকে শুনাতে পারেন না' (ফাতির-২২)। ان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو 'যদি আল্লাহ আপনাকে ক্ষতি করতে চান, তবে তিনি ব্যতীত কেউ নেই যে, তা দূর করে'.....(আন'আম ১৭)।

নবী, অলি প্রভৃতি নেককার মৃত মানুষের নিকটে সাহায্য কামনা করা ও তাদের অসীলায় মুক্তি চাওয়াই হ'ল পৃথিবীর সর্বাধিক প্রাচীন ও আদিম শিরক। তারা বলতো هؤلاء شفعاؤنا عندالله 'ওরা আমাদের জন্য আল্লাহ্র নিকটে সুপারিশকারী মাত্র' (ইউনুস ১৮)।*

হযরত নূহ (আঃ) থেকে শুরু করে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত সকলে এই শিরকের বিরুদ্ধে আমরণ সংগ্রাম করে গেছেন। আল্লাহ্র সত্যিকারের নেক বান্দারা কেয়ামত পর্যন্ত এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যাবেন। অবশ্য সৃষ্টিকর্তা হিসাবে, প্রভু ও প্রতিপালক হিসাবে আল্লাহ্র নিকটে বান্দা যেকোন সময়ে যে কোন সাহায্য চাইতে পারে। এমনকি একটি জুতার ফিতাও আল্লাহ্র নিকটে চাওয়ার হুকুম হাদীছে এসেছে (তির,মিশ হা/২২৫১)। আল্লাহ নিজে আসমান থেকে নেমে এসে সাহায্য করেন না। বরং তাঁর অন্য এক বান্দাকে দিয়ে কিংবা অন্য কোন মাখলুককে দিয়ে এই সাহায্য করে থাকেন। কেননা সকল বনি আদমের অন্তঃকরণ আল্লাহ পাকের দুই আংগুলের মধ্যে রয়েছে। তিনি ইচ্ছামত তা পরিচালিত করেন (মুস,মিশ হা/৮৯)। তিনি মাকড়সাকে দিয়ে তাঁর শেষ নবীকে ছওর গিরি গুহায় সাহায্য করেছিলেন। অতএব সকল বিষয়ে আল্লাহ্র নিকটে সাহায্য চাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

* মাওলানা মুহিউদ্দিন খান অনুদিত ও সংক্ষেপায়িত এবং সঊদী সরকার কর্তৃক প্রচারিত করাচীর মুফতী মুহাম্মাদ শফীকৃত তাফসীরে 'কোন নবী বা কোন অলীর বরাত দিয়ে প্রার্থনা করা আয়াতের মর্ম বিরোধী নয়' বলা হয়েছে। (-ঐ পৃঃ ৫)। একথা কেবলমাত্র জীবিত নবী বা নেককার বান্দার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হ'তে পারে। যেমন নবীর মৃত্যুর পরে হযরত ওমর (রাঃ) বৃষ্টির প্রার্থনার সময় বলেছিলেন, হে আল্লাহ আমরা ইতিপূর্বে নবীর দোহাই দিয়ে বৃষ্টি চাইতাম ও আপনি পানি দিতেন। এখন নবীর চাচা আব্বাস

http://islaminonesite.wordpress.com

(রাঃ)-এর দোহাই দিয়ে বৃষ্টি চাইছি। অতএব আপনি আমাদের বৃষ্টি দান করুন! ফলে বৃষ্টি হয়ে যায়। (বুখারী ১/১৩৭)।

اهدنا الصراط المستقيم - اهدنا। আপনি আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করুন' الصراط। 'রাস্তা' مستقيم 'সোজা-সুদৃঢ়'। অর্থাৎ 'আপনি আমাদেরকে ইসলামের সোজা- সুদৃঢ় পথ প্রদর্শন করুন।' ঐ পথ যা আমাদেরকেও আল্লাহর নিকটে পৌঁছে দেয়, যা আমাদেরকে জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। যা আমাদেরকে হক-এর পথ দেখায় ও হক অনুযায়ী আমল করতে শিখায়'। এই দো'আই হ'ল বান্দার জন্য আল্লাহ্‌র নিকটে সবচাইতে গুরত্বপূর্ণ দো'আ । আর সম্ভবতঃ একারণেই ছালাতের প্রতি রাক'আতে সূরায়ে ফাতিহা পাঠের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নিকটে এই দো'আ করা বান্দার জন্য অপরিহার্য করা হয়েছে' ('তাফসীরে সা'আদী)।

এখানে هدايت কথাটি নবী, অলি ও সাধারণ উম্মত এমনকি সকল মাখলুকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কেননা প্রত্যেকের জন্যই স্তরবিশেষে হেদায়াতের প্রয়োজন রয়েছে। যেমন (১) হোদায়াতের ১ম স্তরে রয়েছে সমস্ত মাখলুক তথা জড়পদার্থ, উদ্ভিদ, প্রাণীজগত ইত্যাদি। এদের মধ্যে স্বল্পমাত্রায় হ'লেও বুদ্ধি ও অনুভূতির অস্তিত্ব রয়েছে। এরা সকলেই আল্লাহ্‌র হিদায়াত অনুযায়ী স্ব স্ব নিয়মে আল্লাহ্‌র গুণগান করে থাকে। যেমন এরশাদ হয়েছে। 'তোমরা কি জানো না যে, আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে, সবকিছুই আল্লাহ্‌র তাসবীহ বা গুণগান করে থাকে? বিশেষ করে পক্ষীকুল যারা সারিবদ্ধভাবে উড়ে বেড়ায়। প্রত্যেকই স্ব স্ব দো'আ ও তাসবীহ সম্পর্কে জ্ঞাত। আল্লাহ তাদের কর্ম সম্পর্কে অবগত' (নূর ৪১)। অন্যত্র আল্লাহ বলেন- الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى 'যিনি প্রত্যেক বস্তুর বিশেষ চরিত্র দান করেছেন। অতঃপর তার উপযোগী হেদায়াত প্রদান করেছেন' (ত্বাহা ৫০)। পবিত্র কুরআনের এই বৈজ্ঞানিক ঘোষণার পরে ইবনুল মাসকাভী প্রমুখ মুসলিম বিজ্ঞানীগণ বৃক্ষের জীবন, নারী-পুরুষের জোড়া ও অনুভূতি প্রমাণ করেন এবং অবশেষে ঢাকার খ্যাতিমান বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু (১৮৫৮-১৯৩৭) 'ক্রেসকোগ্রাফ' যন্ত্র আবিষ্কারের মাধ্যমে উহাতে যুগান্তকারী ভূমিকা রাখেন। হযরত সুলায়মান (আঃ) বহু পূর্বেই পক্ষীকুল এমনকি পিপড়ার ভাষা বুঝতেন। আধুনিক বিজ্ঞান এখনো ততদূর এগোতে পারেনি।

(২) হেদায়াতের ২য় স্তরে রয়েছে জিন ও ইনসান জাতি, যারা অন্যান্য সৃষ্টির চাইতে তীক্ষ্ণধী ও জ্ঞানসমপন্ন। আল্লাহ্‌র পক্ষ হ'তে নবীগণের মাধ্যমে এদের নিকটে হেদায়াত পাঠানো হয়েছে। কেউ তা গ্রহণ করে ধন্য হয়েছে। কেউ প্রত্যাখ্যান করে হতভাগ্য হয়েছে।

(৩) হেদায়াতের ৩য় স্তর হ'ল মুমিন- মুত্তাকীদের জন্য, যাতে তাঁরা অধিকতর নেক বান্দা হওয়ার তাওফীক লাভে ধন্য হন। আল্লাহ্‌র দেওয়া তাওফীক অনুযায়ী এই স্তরে নবী-অলি ও মুত্তাকীদের স্তর বিন্যাস হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ পাক বলেন- 'এই রসূলগণ -আমি তাদের কাউকে কারু উপরে মর্যাদা দিয়েছি। তাদের মধ্যে কারু সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন, আর কারু মর্যাদা উচ্চতর করেছেন' (বাক্বারাহ ২৫৩)। এ তৃতীয় স্তরই মানবের প্রকৃত উন্নতির ক্ষেত্র। এই স্তরের মানুষেরা অধিকতর হেদায়াত লাভের জন্য সর্বদা আল্লাহ্‌র রহমত ও তাওফীক লাভে সচেষ্ট থাকেন। প্রতিনিয়ত এই প্রচেষ্টাই মানুষকে সর্বোচ্চ সৃষ্টির মর্যাদায় অভিষিক্ত করে। এমনকি এক সময় সে

ফেরেশতাদের চাইতে উন্নত মর্যাদায় আসীন হয়। والله ولى التوفيق

হেদায়াত লাভের এই দো'আর মধ্য দিয়ে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, উচু-নীচু সকল পর্যায়ের মানুষেরই সর্বদা সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র হেদায়াত প্রয়োজন। 'নবী -অলিগণ হেদায়াত প্রাপ্ত। অতএব তাঁদের আর ইবাদত প্রয়োজন নেই' এই ধারণার মূলোৎপাটন করা হয়েছে এই আয়াতে প্রদত্ত দো'আর মাধ্যমে। বরং একথাই সত্য যে, উপরে বর্ণিত সকল স্তরের ও সকল পর্যায়ের লোকের জন্য ছিরাতে মুস্তাকীম-এর হেদায়াত সকল সময় যরূরী। সর্বদা সেই হেদায়াত চাওয়ার জন্য আল্লাহ স্বীয় বান্দাকে অত্র আয়াতে শিক্ষা দিচ্ছেন।

এক্ষণে হেদায়াত লাভের পথ কি- এ বিষয়ে অন্য আয়াতে এরশাদ হচ্ছে- والذين جاهدوا فينا لنهدينّهم سبلنا 'যারা আমার রাস্তায় জিহাদ করে, আমি তাদেরকে আমার রাস্তা সমূহ দেখিয়ে থাকি' (আনকাবুত ৬৯)।

'জিহাদ' অর্থ 'সর্বাত্মক প্রচেষ্টা '। যার চুড়ান্ত পর্যায় হ'ল ইসলাম ও ইসলাম বিরোধী কাফিরদের মধ্যেকার সশস্ত্র যুদ্ধ। অতএব কথা, কলম ও সংগঠন-এর মাধ্যমে যারা আল্লাহ্র রাস্তায় সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবে এবং চুড়ান্ত জিহাদ ও শাহাদাতের আকাংখা নিয়ে সর্বদা সমাজ সংস্কারে লিপ্ত থাকবে. আল্লাহ পাক ঐ সকল মুজাহিদ নেক বান্দাকে তাঁর হেদায়াতের রাস্তা সমূহ খুলে দেবেন ইনশাআল্লাহ।

এখানে নবী-রাসূলদের ও আলেম-ওলামার মাধ্যমে হেদায়াত প্রাপ্তির বিষয় ছাড়াও একটি বিষয় কুরআন ও হাদীছে এসেছে, সেটি হ'ল প্রত্যেক মানুষের মধ্যে লুক্কায়িত প্রশান্ত হৃদয় বা نفس مطمئنه যাকে হাদীছে واعظ الله تعالى في قلب كل مسلم 'প্রত্যেক মুসলিমের হৃদয়ে অবস্থিত আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে প্রেরিত ওয়ায়েয বা উপদেশদানকারী' বলা হয়েছে। হাদীছের ভাষায় যা সর্বদা বিপথগামী মুমিনকে আল্লাহ্র পথে ডাকে ও অন্যায় পথে যেতে নিষেধ করে (আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/ ১৯১ 'ঈমান অধ্যায়')। বান্দাকে অন্যায় পথ থেকে বাঁচিয়ে জান্নাতে নেওয়ার জন্য এটাও আল্লাহ প্রদত্ত একটি চিরন্তন হেদায়াত, যার ফলে মানবতা এখনো দাঁড়িয়ে আছে।

صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ 'ঐ সকল ব্যাক্তিদের পথ যাদেরকে আপনি পুরস্কৃত করেছেন।' صراط পথ, এখানে পূর্ববর্তী صراط হ'তে بدل হয়েছে।। الذين অর্থ 'যাদেরকে', انعمت 'আপনি পুরস্কার দান করেছেন, عليهم 'যাদের উপরে'।

কাদেরকে আল্লাহ পুরস্কার দান করবেন, এ সম্পর্কে অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে- 'তারা হলেন নবীগণ, ছিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীল বান্দাগণ' (নিসা ৬৯)।

غير المغضوب عليهم ولا الضالين 'ওদের পথে নয় যারা অভিশপ্ত হয়েছে এবং নয় যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে'। غير নয়, অন্য। مغضوبঅভিশপ্ত , لا নয় , ضالّين পথভ্রষ্টগণ।

আদী বিন হাতিম (রাঃ) হ'তে বর্ণিত মরফূ হাদীছে এসেছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, এই আয়াতে অভিশপ্ত বলতে ইয়াহুদ এবং পথভ্রষ্ট বলতে নাছারাদের বুঝানো হয়েছে (তিরমিযী, আবুদাঊদ, তায়ালিসী)। ইবনু আবী হাতিম বলেন যে, এ বিষয়ে মুফাস্সির গণের মধ্যে কোন মতভেদ আছে বলে আমি জানিনা'(কুরতুবী, ইবনু কাছীর)। ইয়াহুদীরা তাদের নবীদেরকে হত্যা করে এবং শেষনবী (ছাঃ)-এর সঙ্গে গাদ্দারী করে অভিশপ্ত

হয়েছে। পক্ষান্তরে নাছারাগণ তাদের নবী ঈসা (আঃ)-কে অতিরঞ্জিত করে আল্লাহ্‌র আসনে বসিয়ে এবং শেষ নবী (ছাঃ)-কে চিনতে পেরেও মুনাফেকী করে পথভ্রষ্ট হয়েছে।

এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, ইহুদী নাছারাদের স্বভাব যেন মুসলমানদের মধ্যে না আসে এবং তারা যেন ঐ দুই জাতির অপতৎপরতা ও মন্দ পরিণতি সম্পর্কে সর্বদা হুঁশিয়ার থাকে। কেননা তারা ইসলামের স্থায়ী শত্রু। যেমন অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে -يايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء। "হে মুমিন গণ! তোমরা ইয়াহুদ-নাছারাকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করোনা (মায়েদা ৫১)। তবে দুনিয়াবী ক্ষতির হাত থেকে বাঁচার জন্য কাফির-মুশরিকদের সাথে বাহ্যিক ভাবে সম্পর্ক রাখার অনুমতি রয়েছে। যেমন এরশাদ হয়েছে – 'মুমিন ছাড়া কোন কাফিরকে মুমিনগণ বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করবেনা। যদি কেউ এটা করে, তবে তাদের সঙ্গে আল্লাহ্‌র কোন সম্পর্ক থাকবেনা। তবে কি না তোমরা যদি তাদের থেকে কোনরূপ অনিষ্টের আশংকা কর (তবে বাহ্যিক সম্পর্ক রাখা যাবে)। আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর নিজ সত্তার ভয় দেখাচ্ছেন। (মনে রেখ) সবাইকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে' (আল ইমরান ২৮)। একারণে ইসলাম ও ইসলামী রাষ্ট্রের মৌলিক স্বার্থ ক্ষুন্নকারী বিষয়সমূহ বাদে ব্যবসা-বানিজ্য, চাকুরী ইত্যাদি বিষয়ে অমুসলিমদের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে চলার ব্যাপারে কোন আপত্তি নেই।

امين। অর্থ-' হে আল্লাহ আপনি কবুল করুন' (اللهمّ استجب) ইহা اسم فعل অর্থাৎ ইস্‌ম আকারে হলেও ফে'ল-এর অর্থ দেয়।

সূরায়ে ফাতিহা পাঠ শেষে 'আমীন' বলা সুন্নাত। জেহরী ছালাতে সরবে ও সের্রী ছালাতে নিরবে 'আমীন' বলবে। তবে ইমামের পিছনে জেহরী ছালাতে মুক্তাদী সরবে 'আমীন' বলবে না নীরবে বলবে- এ বিষয়ে কিছু বিদ্বান মতভেদ করেছেন। ছহীহ মরফু হাদীছকে অগ্রাধিকার দিতে গেলে জেহরী ছালাতে ইমাম-মুক্তাদী সকলকে নিঃসন্দেহে 'আমীন' জোরে বলতে হবে (দ্রঃনায়েল ৩/৭১-৭৫)। 'আমীন' কথাটি মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্য খাছ। ইতিপূর্বে কোন উম্মতের মধ্যে এর প্রচলন ছিলনা কেবলমাত্র মূসা ও হারূণ (আঃ) ব্যতীত। হযরত মূসা (আঃ) যখন ফেরাউনের নিকটে তাওহীদের দাওয়াত নিয়ে যান, তখন তিনি আল্লাহ্‌র সাহায্য চেয়ে দো'আ করেছিলেনও হারূণ (আঃ) 'আমীন' বলেছিলেন। আল্লাহ দু'ভাইয়ের দো'আ কবুল করেছিলেন এই বলে- قد اجيبت دعوتكما فاستقيما 'তোমাদের দু'জনের দো'আ কবুল হয়েছে। অতএব তোমরা দৃঢ় থাক' (ইউনুস ৮৯), অন্য হাদীছে এসেছে যে, মুসলিম উম্মাহকে তিনটি বস্তু দেওয়া হয়েছে, যা অন্যকে দেওয়া হয়নি। সালাম, সারিবদ্ধ ফেরেশতা ও আমীন'। অন্য হাদীছে এসেছে যে ইহুদীরা 'আমীন' কেই সবচাইতে বেশী হিংসা করে। অতএব তোমরা বেশী বেশী আমীন বলো' (ইবনুমাজাহ, ইবনু আব্বাস হ'তে)। কারণ ইহুদী ও নাছারাদের পথে না গিয়ে ছিরাতে মুস্তাক্বীম-এর হেদায়াত চেয়ে সূরায়ে ফাতিহার শেষে যে দো'আ করা হয় ও পরিশেষে ইমাম মুক্তাদী সকলে সমস্বরে 'আমীন' বলে আল্লাহ্‌র নিকটে যে সমবেত প্রার্থনা পেশ করা হয়, এটা তারা বরদাশ্‌ত করতে পারে না।

সারমর্মঃ সূরায়ে ফাতিহা পবিত্র 'কুরআনের মা'। এর মধ্যেই সমগ্র কুরআনের মূল বিষয়বস্তু নিহিত। তাওহীদ, আহকাম ও নছীহতের ত্রিবিধ সমাহার আছে এ সূরাতে। তাওহীদে রবুবিয়াত যেমন ফুটে উঠেছে ১ম আয়াতের মধ্য,তওহীদে আসমা ও ছিফাত তেমনি ফুটে উঠেছে ১ম, ২য় ও ৩য় আয়াতে। যারা নিরেট একত্ববাদ প্রমাণ করতে গিয়ে আল্লাহকে গুনহীন

সত্তা মনে করেন, তাদের সেই ভুল ধারণার প্রতিবাদ রয়েছে এই আয়াত গুলিতে। ৪র্থ আয়াতে তাওহীদে এবাদত বা উলূহিয়াতের বিষয়ে যেমন সুস্পষ্ট বক্তব্য এসেছে, তেমনি আব্দ ও মা'বুদ এর পার্থক্য এবং আবদ্-এর করণীয় সম্পর্কেও বলা হয়েছে। এই আয়াতে স্রষ্টা ও সৃষ্টির একই সত্তায় বিলীন হওয়ার অদ্বৈতবাদী দর্শনের তীব্র প্রতিবাদ রয়েছে। অতঃপর ৫ম আয়াতটিই হ'ল এই সূরার প্রাণ। যেখানে বান্দার পক্ষ হ'তে আল্লাহ্র নিকটে 'ছিরাতে মুস্তাক্বীম'-এর হেদায়াত প্রার্থনা করা হয়েছে। সমস্ত কুরআন যার জওয়াব হিসাবে এসেছে।

মুহাম্মাদ বিনুল হানাফিইয়াহ(রা:) বলেন, এটাই হ'ল আল্লাহ্র দীন, যা ব্যতীত বান্দার কোন কিছুই কবুল করা হবেনা।' দীনের আরকান- আহকামের উপরে আমল ব্যতীত শুধুমাত্র প্রার্থনা দিয়ে কোন কাজ হবে না, যা অদৃষ্টবাদী জাবরিয়া দর্শনের প্রতিবাদ করে। অনুরূপভাবে শুধু আমল দিয়েও কাজ হবেনা, যদি না সেখানে আল্লাহ্র রহমত থাকে। সে জন্য আল্লাহ্র নিকটে হেদায়াত চেয়ে প্রার্থনা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। ফলে এই আয়াত ক্বাদারিয়া, মু'তাযিলা প্রভৃতি ভ্রান্ত বিশ্বাসীদের প্রতিবাদ করে, যারা মানুষকেই তার ভাল-মন্দ কর্মের স্রষ্টা মনে করে। পরিশেষে ইহুদী-নাছারাদের মত অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট না হওয়ার জন্য মুসলিম উম্মাহ্র প্রতি উদাত্ত আহবান জানিয়ে সূরায়ে ফাতিহার উপসংহার টানা হয়েছে।

আল্লাহ আমাদেরকে ছিরাতে মুস্তাকীম-এর পথ প্রদর্শন করুন। আমীন!!

দরসে হাদীছ

কল্যাণের চাবি

- মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল- গালিব

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِءٍ مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُه إِلي اللّٰهِ وَرَسُوْله فَهِجْرَتُه إِلي اللّٰهِ وَرَسُوْلِه ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُه إِلي دُنْيَا يُصِيْبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُه إِلي مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

১. শাব্দিক ব্যাখ্যাঃ إِنَّمَا - كلمة الحصر বা কৈবল্য বোধক শব্দ। অর্থ- 'ইহা ব্যতীত নয়' الأعْمَالُ-عمل এর বহুবচন। অর্থাৎ আমল সমূহ।

ب -'হরফে জার' অর্থ দ্বারা বা সহিত।

النِّيَّات-نِيَّةٌ এর বহুবচন। নিয়াত বা নিইয়াত দু'টিই জায়েয। অর্থঃ সংকল্প। শারঈ পরিভাষায় 'নিয়াত' অর্থ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির লক্ষ্যে অন্তরকে কোন কাজের দিকে রুজু করা, النية لغة القصد و شرعا توجه القلب نحو الفعل ابتغاء لوجه الله (مرقاة ١/٤٠)। لِكُلِّ امْرِءٍ 'সকল মানুষের জন্য' مَانَوَي 'যা সে সংকল্প করে'। فَمَنْ 'অতঃপর যে ব্যক্তি' كَانَتْ هِجْرَتُه 'যার হিজরত হবে'। 'হিজরত' অর্থ পরিত্যাগ করা। শারঈ পরিভাষায় কেবলমাত্র দীনের স্বার্থে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কুফরী দেশ হ'তে ইসলামী দেশে স্থায়ী ভাবে আগমনকে 'হিজরত' বলা হয়। يُصِيْبُهَا 'সে তাই পাবে'। اِمْرَأَةٌ মহিলা يَتَزَوَّجُهَا 'সে তাকে বিয়ে করবে'। إِلي مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ 'সেইদিকে

যে দিকে সে হিজরত করে'।

২. **অনুবাদঃ** হযরত উমার বিনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেন, নিশ্চয়ই সমস্ত আমল নিয়তের উপরে নির্ভরশীল এবং প্রত্যেকে অতটুকু পাবে, যতটুকুর জন্য সে নিয়ত করবে। অতঃপর যে ব্যক্তি হিজরত করেছে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে, তার হিজরত আল্লাহ ও রাসূলের দিকেই হয়েছে। কিন্তু যে ব্যক্তি হিজরত করেছে দুনিয়ায় পাওয়ার জন্য বা কোন নারীকে বিবাহ করার জন্য, সে ব্যক্তির হিজরত সেজন্যেই হয়েছে'।- মুত্তাফাকুন আলাইহ (বুখারী ও মুসলিম)।

৩. **বিষয় বস্তুঃ** হাদীছ অধ্যয়ন ও তদনুযায়ী আমলের মাধ্যেমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করার চূড়ান্ত লক্ষ্য নির্ধারণের জন্য নিয়তকে খালেছ করাই অত্র হাদীছের মূল বিষয়বস্তু। এই মহতী গ্রন্থ সংকলনের পিছনে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করাই একমাত্র লক্ষ্য একথা সম্মানিত 'মিশকাত' সংকলক নিজের জন্য যেমন বুঝাতে চেয়েছেন, তেমনি সুধী পাঠকবৃন্দকেও সেদিকে ইংগিত করেছেন। সালাফে ছালেহীন বিদ্বানগণ তাঁদের সকল দীনী কাজের শুরুতে এই হাদীছকে আগে নিয়ে আসতে পসন্দ করতেন। মুহাদ্দিছকুল শিরোমনি ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বুখারী (রহঃ) এবং অন্যান্য মুহাদ্দিছ বিদ্বানগণ তাঁদের স্ব স্ব কেতাবের শুরুতে অত্র হাদীছকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তাঁদের অনুকরণে সম্মানিত সংকলক নিয়তের হাদীছকে মিশকাতের প্রথমে এনেছেন। আমরা অনুবাদক ও পাঠকমহল সকলে হাদীছের এই বিশ্ববিখ্যাত সংকলন গ্রন্থ অধ্যয়নের শুরুতে স্ব স্ব নিয়তকে আল্লাহ্র জন্য খালেছ করে নিই এবং তাঁর নিকটে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদেরকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে আমাদের জীবন, পরিবার ও সমাজ গঠনের তাওফীক দান করেন। আমীন!!

৪.**গুরুত্বঃ** 'এই হাদীছটি এমন গুরুত্বপূর্ণ হাদীছ সমূহের অন্যতম যার উপরে দীন আবর্তিত হয়'। আব্দুর রহমান বিন মাহ্দী, আলী বিনুল মাদীনী, আহমাদ বিন হাম্বল, শাফেঈ, আবুদাঊদ, তিরমিযী প্রমুখ মুহাদ্দেছীন বলেন যে, এই হাদীছটি দীনের এক তৃতীয়াংশ। কারণ বান্দার সকল কাজ সম্পন্ন হয় তার সংকল্প, বক্তব্য ও কর্ম তৎপরতার মাধ্যমে। উক্ত তিনটি বিষয়ের মধ্যে সংকল্পটিই হ'ল প্রথম ও প্রধান।

হাফেয ইবনুহাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, মুওয়াত্ত্বা মালেক ব্যতীত এমন কোন বিশ্বস্ত হাদীছ গ্রন্থ নেই, যেখানে অত্র হাদীছটি বর্ণিত হয়নি। ইমাম বুখারী (রহঃ) এই হাদীছটি তাঁর কিতাবের প্রথমে এনেছেন ও অন্য আরও কয়েকটি স্থানে এনেছেন। ইমাম মুসলিম (রহঃ) তাঁর কিতাবের 'জিহাদ' অধ্যায়ের শেষে অত্র হাদীছটি নিয়ে এসেছেন। হাদীছটি একজন মাত্র রাবী কর্তৃক বর্ণিত 'খবরে ওয়াহেদ' পর্যায়ের হ'লেও পরবর্তীতে ব্যাপক প্রসিদ্ধির কারণে 'মুতাওয়াতির' (متواتر معنوي) এর স্তরে উন্নীত হয়েছে

৫.**'খবরে ওয়াহেদ' দলীল হওয়ার প্রমাণ ঃ** একজন বিশ্বস্ত রাবীর বর্ণিত ছহীহ হাদীছ বা 'খবরে ওয়াহেদ' ইসলামী আইনের অন্যতম দলীল হিসাবে গৃহীত হবে, এ বিষয়ে অত্র হাদীছটি একটি শক্তিশালী প্রমাণ। ইসলামী শরীয়তের অন্যতম প্রধান গুরুত্বপূর্ণ এই হাদীছটির একমাত্র রাবী হলেন ইসলাম জগতের ২য় খলীফা হযরত ওমর ফারূক (রাঃ)। তাঁর নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন

একমাত্র ব্যক্তি আলক্বামা বিন আবু ওয়াক্কাছ। তাঁর নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন একমাত্র ব্যক্তি মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম তায়মী। তাঁর নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন একমাত্র ব্যক্তি ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ আনছারী। অতঃপর হাদীছটি ব্যাপক প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং ২০০ শতের অধিক বিদ্বান এই হাদীছটির বর্ণনাকারী হওয়ার মর্যাদা লাভ করেন।

৬. রাবীর পরিচয়ঃ

হাদীছের একমাত্র রাবী হলেন আবু হাফ্ছ উমার বিনুল খাত্ত্বাব বিন নুফাইল বিন আব্দুল উয্যা আল-আদাভী আল-কুরায়শী আল-মাদানী। যাঁর বংশ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রপিতামহ কা'আব বিন লূঈ-র সাথে মিলেছে। 'আবু হাফ্ছ' রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দেওয়া কুনিয়াত বা উপনাম, যার অর্থ সিংহ। 'ফারূক' নামটিও আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর দেওয়া লক্বব বা উপাধি যার অর্থ 'হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য কারী'। রাসূলের দো'আর বরকতে ৬ষ্ঠ নববী বর্ষে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁকে দিয়েই ইসলাম গ্রহণকারীর সংখ্যা ৪০ পূর্ণ হয়। তিনিই প্রথম ইসলাম গ্রহণের পর পরই কা'বা ঘরে গিয়ে প্রকাশ্যভাবে ছালাত আদায় করেন (তির, মিশ হা/৬০৩৬) এবং তাঁর মাধ্যমেই ইসলামের প্রচার প্রকাশ্যভাবে আরম্ভ হয়। জীবদ্দশায় জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজন শ্রেষ্ঠ ছাহাবী তথা 'আশারায়ে মুবাশ্শারাহ্'র তিনি ছিলেন অন্যতম সেরা ব্যক্তিত্ব। যাঁর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'যদি কেউ আমার পরে নবী হ'তেন, তবে ওমরই হ'তেন' (তির, মিশ, হা/ ৬০৩৮)। আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ)-এর মৃত্যুর পরে তিনি খলীফা হন এবং তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি নিজেকে'খলীফাতুন নবী' বা নবীর খলীফা না বলে 'আমীরুল মুমিনীন' অর্থাৎ মুমিনদের আমীর উপাধি গ্রহণ করেন। বদরের যুদ্ধ সহ সকল গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে তিনি আল্লাহ্র রাসূলের (ছাঃ) সাথী ও পরামর্শদাতা ছিলেন। ইরান, ইরাক, মিসর ও সিরিয়া সহ বড় বড় বিজয় তাঁর খেলাফত কালে সাধিত হয়। ইসলামের নৈতিক ও বৈষয়িক উন্নতি তাঁর আমলে তুঙ্গে ওঠে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে তাঁর মাধ্যমে বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা ৫৩৯। তার মধ্যে বুখারী ও মুসলিম মিলিতভাবে সংকলন করেছেন ৮১টি, এককভাবে বুখারী করেছেন ৩৪টি ও মুসলিম করেছেন ২১টি। তাঁর আংটিতে লেখা ছিল كفي بالموت واعظا 'মৃত্যুই উত্তম উপদেষ্টা'। (মিরক্বাত)। ইসলামের বিধান মানার ব্যাপারে তিনি ছিলেন অত্যন্ত কঠোর। আবুবকরের পরে তিনিই ছিলেন রাসূলের সবার্ধিক প্রিয় ছাহাবী ও পরামর্শদাতা। তাঁর হক পরামর্শ ও ন্যায়পরায়নতার প্রশংসায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ ওমরের যবান ও হৃদয়কে হক-এর অনুগত করে দিয়েছেন (তির, মিশ, হা/ ৬০৩৩)। তিনি আরও বলেন, ওমর যে রাস্তায় চলেন, শয়তান তা ছেড়ে অন্য রাস্তায় চলে' (মুত্তা, মিশ/ ৬০২৭)। তিনি অন্যত্র বলেন 'আমি দেখি জিন ও ইনসানের শয়তানগুলো ওমরকে দেখলে পালায়' (তির, মিশ/৬০৪০)। ১০ বছর খেলাফতে সমাসীন থাকার পরে ২৩ হিজরীর ২৫ শে যিলহজ্জ বুধবার মদীনার মসজিদে নববীতে ফজরের ছালাতে ইমামতি করা অবস্থায় ছাহাবী মুগীরাহ বিন শো'বার বিক্ষুব্ধ মজূসী গোলাম আবু লুলু ফিরোয তাঁকে অস্ত্রাঘাতে আহত করে ও তিনদিন পরে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।(ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাহে রাজেঊন)। তাঁর অনুরোধ ও মা আয়েশার আনুমোদন ক্রমে ২৪ হিজরীর ১লা

http://islaminonesite.wordpress.com

মুহররম রবিবারে রাসূলের (ছাঃ) হুজরার মধ্যে আবু বকর (রাঃ) - এর পাশেই তিনি কবরস্থ হন। ছোহায়েব (রাঃ) তাঁর জানাযায় ইমামতি করেন। দাফনকালে হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) বলেছিলেন- ذهب اليوم بتسعة أعشار العلم 'ইল্‌মের ১০ ভাগের ৯ ভাগ আজকে বিদায় হ'ল' (মির'আত)।

৫.হাদীছের ব্যাখ্যাঃ- إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ইমাম নবভী (রহঃ) এর ব্যাখ্যা করেছেন যে 'শারঈ আমলসমূহ নিয়তের উপরে নির্ভরশীল। নাপাকী দূর করা বা অনুরূপ কোন কাজে নিয়ত শর্ত নয়।' وَ إِنَّمَا لِكُلِّ امْرِءٍ مَا نَوَى 'নিশ্চয়ই মানুষ অতটুকুই পাবে, যতটুকুর জন্য সে নিয়ত করবে।' ইমাম খাত্ত্বাবী বলেন, একথার দ্বারা কোন আমলকে নিয়ত দ্বারা খাছ করা অর্থ বুঝানো হয়েছে। যেমন যদি কেউ ক্বাযা ছালাত আদায় করতে চায়, তবে তাকে যোহর, আছর বা অন্য কোন ছালাতের নির্দিষ্টভাবে নিয়ত করতে হবে। 'আম' ভাবে ক্বাযা ছালাতের নিয়ত করলে চলবে না। ইমাম নবভীও অনুরূপ অর্থ করেছেন। হাদীছের শুরুতে সকল আমলকে নিয়াতের উপরে নির্ভরশীল বলা হয়েছে। কিন্তু وَ إِنَّمَا لِكُلِّ امْرِءٍ مَا نَوَى বলে তাকে খাছ করা হয়েছে। অর্থাৎ বান্দার যাবতীয় নেক আমলের ছওয়াব নির্ভর করছে তার নেক নিয়ত বা সংকল্পের দৃঢ়তা ও স্বচ্ছতার উপরে। নেকীর কাজের নিয়ত করলে নেকী পাওয়া যায়, যদি ও তা বাস্তবায়ন করতে সক্ষম না হয়, পক্ষান্তরে গোনাহের কাজের নিয়ত করলেও আল্লাহ তার হিসাব নিবেন। যদি সে তা বাস্তবায়িত না করে তবে আল্লাহ তার উপরে কেয়ামতের দিন শাস্তি মওকুফ করবেন (কুরতুবী)।

فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَي اللهِ وَ رَسُوْلِه... এখান থেকে শেষ পর্যন্ত পূববর্তী অংশের ব্যাখ্যা এসেছে। বলা হচ্ছে 'যার হিজরত আল্লাহ ও রাসূলের দিকে হবে, তার হিজরত সেজন্যেই হবে' অর্থাৎ যার হিজরত কেবলমাত্র দীনের স্বার্থে ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য কুফরী দেশ হ'তে ইসলামী দেশে হবে, তার হিজরত আল্লাহ্‌র নিকটে কবুল হবে ও সে আখেরাতে পূর্ণ ছওয়াবের অধিকারী হবে। কিন্তু যার হিজরত দুনিয়ার জন্য বা কোন মহিলার জন্য হবে, তার হিজরত সেজন্যেই হবে।' অর্থাৎ সে কোন রূপ ছওয়াব পাবে না। এখানে 'দুনিয়া' এবং 'মহিলা' স্রেফ উদাহরণ হিসাবে আনা হয়েছে। অমনিভাবে কোন মহিলা যদি কোন পুরুষের উদ্দেশ্যে হিজরত করে তারও ফলাফল একই রূপ হবে। উপরোক্ত দু'টি বিষয়ের প্রতি মানুষের আকর্ষণ সর্বাধিক। সেকারণ উদাহরণ হিসাবে এখানে এ দু'টি বিষয়কে ব্যবহার করা হয়েছে। 'ক্বায়লাহ' নাম্নী জনৈকা মহিলা যিনি 'মুহাজিরে উম্মে 'ক্বায়েস' নামে প্রসিদ্ধ, তাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে জনৈক ব্যক্তি মক্কা হ'তে মদীনায় হিজরত করেছিলেন এবং সেকারণেই অত্র হাদীছের অবতারণা ঘটেছে বলে যে কথা প্রচলিত আছে, তার কোন ছহীহ ভিত্তি নেই (মির'আত)।

'মুত্তাফাক আলাইহ' متفق عليه ঃ একই ছাহাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীছ যা ইমাম বুখারী ও মুসলিম উভয়ে সংকলন করেছেন, তাকে 'মুত্তাফাক আলাইহ' বলা হয়। হাদীছের স্তরসমূহের মধ্যে 'মুত্তাফাক আলাইহ' হাদীছ হ'ল বিশুদ্ধতম। তার পরের স্থান হ'ল এককভাবে বুখারী ও এককভাবে মুসলিম-এর।

৭.মাসআলাঃ সকল শুভ কাজের শুরুতে অন্তরে 'নিয়ত' করতে হবে, এ বিষয়ে উপরে বর্ণিত

হাদীছের আলোকে সকল বিদ্বান একমত। কেননা নিয়ত বা সংকল্পের স্থান হ'ল হৃদয় জগতে। কিন্তু পরবর্তীকালে মাননীয় 'হেদায়া' লেখক আল্লামা বুরহানুদ্দীন আলী বিন আবু বকর আল-ফারগানী আল-মারগীনানী (৫১১-৫৯৩ হিঃ) ছালাতের শুরুতে 'মুখে আরবী ভাষায় নিয়ত পাঠ করা উত্তম' বলেন। উক্ত ফৎওয়ার অনুসরণে বাংলাদেশসহ উপমহাদেশে বিভিন্ন প্রকার ছালাত ও ছিয়ামের জন্য বিভিন্ন প্রকার আরবী নিয়ত চালু হয়েছে। 'মুখে নিয়ত পাঠ না করলে ছালাত সিদ্ধ হবেনা' বলে অনেকে ফৎওয়া দিয়ে থাকেন। এর ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, অনেকে নিয়ত মুখস্ত করতে না পেরে ছালাত আদায় করেন না। আবার যারা ছালাত আদায় করেন, তাদের অনেকে ভুল উচ্চারণে ও ভুল নিয়ত পাঠে ছালাত বরবাদ করেন। অথচ নিয়ত পাঠের কোন প্রমাণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈনে এযাম এমনকি চার ইমামের কারু থেকে বর্ণিত নেই। এটি সম্পূর্ণ কপোলকল্পিত ও ধারণা ভিত্তিক। যেমন স্বয়ং 'হেদায়া' লেখক নিয়তের আলোচনায় স্পষ্টভাবেই বলেছেন النيـة هي الارادة والشـرط ان يعـمل بقلبـه اي صلوة يصلى أمـا الذكـر باللسـان فـلا معتبـر بـه ويحسن ذلك لإ جتمـاع عزيمتـه- هداية مع اشرف الهداية (عربي - اردو) ٣٩١/١ 'নিয়ত অর্থ এরাদা বা সংকল্প করা। এর শর্ত হ'ল অন্তরে এ বিষয়ে জানা যে, কোন্ ছালাত সে আদায় করছে। মুখে উচ্চারণ করার কোন গুরুত্ব নেই। অবশ্য সংকল্পকে কেন্দ্রীভূত করার জন্য উহা উত্তম'। শেষের কথাটুকুতেই মুখে আরবী নিয়ত পাঠের রেওয়াজ চালু হয়েছে। যদিও লেখক নিজে এর তেমন কোন গুরুত্ব দেননি। ইমাম ইবনুল হুমাম (রহঃ) বলেন, হাদীছ শাস্ত্রবিদগণের অনেকে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে ছহীহ বা যঈফ সনদে এরূপ কোন হাদীছ পাওয়া যায় না যে, তিনি ছালাত শুরু করার সময় মুখে এরূপ বলেছেন যে, 'আমি অমুক ছালাত শুরু করছি।' এ ধরণের কোন বক্তব্য ছাহাবা ও তাবেঈন কারু নিকট থেকে পাওয়া যায় না। বরং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে একথাই প্রমাণিত যে, তিনি যখন ছালাতে দাঁড়াতেন, 'তখন আল্লাহু আকবর' বলতেন। অতএব মুখে নিয়ত পাঠ করা বিদ'আত।-মিরক্বাত ১/৪০ পৃঃ।

৮. উপসংহারঃ

নিয়তের গুরুত্বের উপরে বর্ণিত অত্র হাদীছটি মুসলিম উম্মাহ্কে তার জীবনের মূল উদ্দেশ্য 'আমর বিন মা'রূফ' ও 'নাহি আনিল মুন্কার'-এর কথা সর্বদা স্মরণ করিয়ে দেয়। ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধের দৃঢ় সংকল্প নিয়ে সে যেন তার জীবন পথে পদচারণা করে। মুসলিম জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্যই হ'ল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও জান্নাত লাভ করা। সেই লক্ষ্য হাছিলের প্রধান শক্তি হ'ল দৃঢ় সংকল্প। স্থির লক্ষ্য ও দৃঢ় সংকল্প ব্যতীত জীবনে কিছুই অর্জন করা সম্ভব নয়। সমাজের প্রকৃত কল্যাণ সৎ নিয়তের উপরেই নির্ভরশীল। তাই নিয়তের এই হাদীছটিকে যথার্থভাবেই 'কল্যাণের চাবি' বলা যেতে পারে।

আত-তাহরীক-এর যাত্রাশুরুতে অত্র হাদীছের অবতারণার মাধ্যমে আমরা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের চূড়ান্ত লক্ষ্যে আমাদের দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করছি। আল্লাহ আমাদের নেক-নিয়ত পূর্ণ করুন। আমীন!!

প্রবন্ধ

ঈমান

- মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

'ঈমান' আমন ধাতু হতে উৎপন্ন। যার অর্থ ভীতিশূন্য নিশ্চিন্ত বিশ্বাস الايمان قد اشتق من الامن اي الثقة ضد الخوف। পারিভাষিক অর্থে বিশ্বপ্রভু আল্লাহ্‌র উপরে একনিষ্ঠভাবে বিশ্বাস স্থাপন করাকে 'ঈমান' বলে। ছোট্ট কচি শিশু তার মায়ের কোলকে তার জন্য নির্বিঘ্ন নির্ভরকেন্দ্র বলে স্থির বিশ্বাস পোষণ করে। পিতার বন্ধু তাকে বেশী করে আদর করলেও সে পিতাকেই নিশ্চিন্ত আশ্রয় মনে করে। পিতার বুকে গিয়ে মুখ লুকায়। আল্লাহ্‌র বান্দা তার সুখে-দুঃখে, বিপদে-সম্পদে সর্বদা আল্লাহকেই তার একমাত্র আশ্রয় বলে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। তাঁরই এবাদত করে, তাঁর নিকটেই সাহায্য প্রার্থনা করে, তাঁকেই বুক ভরে ডেকে শান্তি পায়। দেহ মন উৎফুল্ল হয়। হৃদয় প্রশান্তি লাভে ধন্য হয়।

মূলতঃ আল্লাহ্‌র উপরে বিশ্বাসকে বুকে ধারণ করেই মুমিন তার জীবনপথে এগিয়ে চলে। আল্লাহ্‌র রহমতের তুলনায় সে দুনিয়ার সবকিছুকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। শত বাধা উপেক্ষা করে সে সম্মুখপানে এগিয়ে চলে দুর্বার গতিতে আল্লাহ্‌র রহমত লাভের উদগ্র বাসনা নিয়ে। যে কাজে আল্লাহ খুশী হন, সে কাজে সে ব্যাকুলভাবে ঝাপিয়ে পড়ে। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও পরকালীন মুক্তি লাভই তার যাবতীয় কর্মকান্ডের মূল লক্ষ্য হ'য়ে দাঁড়ায়। এই বিশ্বাস এই ঈমান মুমিনকে পরিচালিত করে স্থির লক্ষ্যপথে। জীবনযুদ্ধের ঝঞ্ঝাবাতে সে কখনো লক্ষ্যচ্যুত হয়না। দুনিয়ার শত আনন্দ-উপাচারেও সে দিশেহারা হয় না। কম্পাসের স্থির কাঁটার মত আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের স্থির লক্ষ্য হ'তে সে বিচ্যুত হয় না। প্রচন্ড দুপুরে মরুভূমির স্ফুলিঙ্গ সদৃশ বালুর উপরে নগ্নপিঠে চিৎ করে শুইয়ে বুকে পাথর চাপা দিয়ে অবর্ণনীয় কষ্ট ভোগের মধ্যে ও নির্যাতিত বেলাল আর্ত কণ্ঠে বলে ওঠেন 'আহাদ' 'আহাদ' 'তুমি এক' 'তুমি এক'। ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর মুজাহিদ ঝাপিয়ে পড়ে জিহাদের ময়দানে জান্নাতের সুগন্ধি লাভের উদগ্র বাসনায়, আর হাতে ধরা খেজুর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে জান্নাত পাগল উমায়ের বিনুল হুমাম দুনিয়াবী কামনা-বাসনার প্রতি তাচ্ছিল্যভরে বলে ওঠেন 'বাখ্' 'বাখ্' (মুস, মিশ,হা/ ৩৮১০)। ঈমান পরিত্যাগের বিনিময়ে জীবন বাঁচানোর লোভনীয় প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে শূলে বিদ্ধ অবস্থায় তীব্র যন্ত্রণায় কাতর খুবায়েব দৃঢ় কণ্ঠে বলে ওঠেন

لست ابالي حين اقتل مسلما -
علي اي جنب كان في الله مصرعي
وذلك في ذات الاله وان يشاء -
يبارك في اوصال شلو ممزع •

'আমি কোন কিছুরই পরোয়া করিনা যখন আমি মুসলিম হিসাবে নিহত হই। আল্লাহ্‌র রাহে যেভাবেই আমাকে পর্যদুস্ত করা হউক, তা কেবল আল্লাহ্‌র জন্যই করা হচ্ছে। তিনি ইচ্ছা করলে আমার বিচ্ছিন্ন অংগ সমূহে বরকত দান করবেন' (বুখারী ২/৫৬৯ পৃঃ)।

বলাবাহুল্য আল্লাহ্‌র উপরে এই স্থির বিশ্বাস, তাঁর উপরে এই নিশ্চিন্ত নির্ভরতা একেই বলে 'ঈমান'। এই ঈমান কেবলমাত্র বিশ্বাসেই সীমাবদ্ধ নয় বরং মুহাদ্দেছীনের পরিভাষায় ঈমানের সংজ্ঞা হ'ল الايمان هو التصديق بالجنان والاقرار باللسان والعمل بالاركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية

'হৃদয়ে বিশ্বাস, মুখে স্বীকৃতি ও কর্মে বাস্তবায়নের সমন্বিত নাম হ'ল ঈমান, যা আনুগত্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও গুনাহে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়'।

http://islaminonesite.wordpress.com

এই ঈমানের ফলে একজন মুমিন সুন্দর মানুষে পরিণত হয় এবং প্রতি মুহূর্তে সে আরও ভাল ও আরও সুন্দর মানুষ হ'তে চেষ্টা করে। সাময়িক দূর্বলতায় গোনাহ করে ফেললেও সে সঙ্গে সঙ্গে তওবা করে ফিরে আসে। অনুতপ্ত হ'য়ে আল্লাহ্‌র হুযুরে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে। আইনের কাছে ধরা দিয়ে দুনিয়াবী শাস্তি গ্রহণের মাধ্যমে পরকালীণ মুক্তি লাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ে। আর প্রাণভরে প্রার্থনা করে বলে اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا..... 'হে আল্লাহ! আমি স্বীয় নফসের উপরে বহু যুলম করেছি। আমার গুনাহসমূহ মাফ করার কেউ নেই আপনি ব্যতীত। আপনি আমাকে আপনার পক্ষ হতে বিশেষভাবে ক্ষমা করুন এবং আমার উপরে রহম করুন। নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান।'

প্রতিদিন ছালাতে মুমিন তার প্রভুর নিকটে এভাবেই তার আমলের হিসাব পেশ করে। গুনাহের স্বীকৃতি দেয়, ক্ষমা ভিক্ষা করে ও আরও সুন্দর মুমিন হওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র রহমত প্রার্থনা করে থাকে। এই ভাবে ব্যক্তি শুদ্ধির ফলে ক্রমে সমাজ শুদ্ধ হয়। অন্যায় অপকর্মের শয়তানী তৎপরতা দমিত হয়। ন্যায়নীতি জয়লাভ করে। নেকী ও সৎকর্মের প্রাণবন্যায় সমাজ পরিশুদ্ধ হয়। শান্তি ও সমৃদ্ধি সর্বত্র পরিব্যপ্ত হয়। মানবতা পরিপূর্ণতা লাভ করে। ঈমানের পূণ্য পরশে জগত সংসার ধন্য হয়।

ঈমানের কতকগুলি 'রুক্‌ন' আছে, যার কোন একটিতে বিশ্বাস না থাকলে কিংবা সন্দেহ থাক্‌লে অথবা বিশ্বাসের ঘাটতি হলে আর ঈমান থাকেনা। সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিতভাবে যাকে' ঈমানে মুজ্‌মাল' ও 'ঈমানে মুফাছ্‌ছল' বলা হয়ে থাকে। 'ঈমানে মুজ্‌মাল' যেমন..... امنت بالله كماهو باسمائه 'আমি ঈমান আনলাম আল্লাহ্‌র উপরে যেমন তিনি। তাঁর যাবতীয় নাম ও গুণাবলী সহকারে। এবং আমি কবুল করলাম তাঁর যাবতীয় আদেশ -নিষেধ ও রুকন সমূহকে ঈমানে মুফাছ্‌ছল যেমন امنت بالله وملائكته.... ' আমি ঈমান আনলাম (১) আল্লাহ্‌র উপরে (২) তাঁর ফেরেস্তাগণের উপরে (৩) তাঁর কেতাব সমূহের উপরে (৪) তাঁর রাসূলগণের উপরে (৫) কিয়ামত দিবসের উপরে এবং (৬) আল্লাহ্‌র পক্ষ হ'তে নির্ধারিত তাকদীরের ভাল ও মন্দের উপরে'।

ঈমানে মুজমালের মধ্যে আল্লাহ্‌র সত্তা এবং তাঁর নাম ও গুণাবলীর উপরে বিশ্বাস স্থাপনের সাথে সাথে তাঁর যাবতীয় হুকুম-আহকাম ও ফারায়েয ওয়াজিবাত-এর উপরে ঈমান আনা ও তা কবুল করে নেওয়ার স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। অতএব ঈমান কেবল 'আল্লাহ ও বান্দার মধ্যকার ব্যক্তিগত সম্পর্কের নাম নয়' বরং তা বান্দার সার্বিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। আল্লাহ্‌র সত্তা কেমন তা কারু জানা নেই, সে জন্য বলা হয়েছে 'কামা হুয়া' যেমন তিনি। তিনি নিরাকার নন। তাঁর নিশ্চয়ই আকার রয়েছে। কিন্ত সে আকার কেমন তা কারু জানা নেই। আল্লাহ নিজেই নিজের পরিচয় দিয়ে বলেন, ليس كمثله شئ وهوالسميع البصير। 'তাঁর তুলনীয় কিছুই নেই। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা' (শূরা-১১)। ولم يكن له كفوا احد। 'তাঁর সমকক্ষ নেই' (ইখলাছ ৪)। سبحان ربك رب العزة عما يصفون' আপনার প্রভু সম্পর্কে তারা যে সব কথা বলে থাকে, সবকিছু থেকে আপনার সম্মানিত প্রভু অতি পবিত্র (ছাফ্‌ফাত ১৮০)। আল্লাহ্‌র সত্তার উপরে ঈমান

আনার সাথে সাথে তাঁর নাম ও গুণাবলীর উপরে ঈমান আনতে হবে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সমূহে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে সেভাবেই। কোন রূপক অর্থ বা কল্পিত ব্যাখ্যা ছাড়াই কুরআনী আয়াত ও ছহীহ হাদীছ সমূহের প্রকাশ্য অর্থের উপরে ঈমান পোষণ করতে হবে। আল্লাহ্র সত্তা ও গুণাবলীকে বান্দার সত্তা ও গুণাবলীর সদৃশ মনে করা যাবে না কিংবা মূল অর্থ পরিত্যাগ করে কোন গৌণ অর্থও গ্রহণ করা যাবে না। যেমন 'আল্লাহ্র হাত' অর্থ 'তাঁর কুদরত' 'তাঁর চেহারা' অর্থ 'তাঁর সত্তা' ইত্যাদি করা যাবে না।

ঈমানে মুজমালের ২য় অংশে আল্লাহ প্রেরিত যাবতীয় আহকাম ও আরকান কবুল করে নেওয়ার স্বীকৃতি ঘোষণা করা হয়েছে। ইসলামী শরীয়তে নির্ধারিত যাবতীয় ফরয-সুন্নাত, হালাল-হারাম, জায়েয-নাজায়েয সবকিছুকে যথাযথভাবে মেনে চলা মুমিনের অপরিহার্য কর্তব্য। আল্লাহ নির্ধারিত কোন হালালকে হারাম জ্ঞান করা বা কোন হারামকে হালাল মনে করা সম্পূর্ণ কুফরী। এই অধিকার আল্লাহ পাক কোন বান্দাকে দেননি।

যেমন আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের মুখ থেকে সাধারণতঃ যেসব মিথ্যা বের হয়ে আসে, তেমনি করে তোমরা আল্লাহ্র বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে বলোনা যে, এটা হালাল ও ওটা হারাম। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্র বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করে, তারা সফলকাম হবে না' (নাহ্ল১১৬)।

আল্লাহ্র উপরে ঈমান আনার পরে ঈমানের বাকী পাঁচটি রুকন তথা ফিরিশতা গণের উপরে ঈমান, আল্লাহ্র কেতাবসমূহের উপরে ঈমান, রাসূলগণের উপরে ঈমান, কেয়ামতের উপরে ঈমান, তাকদীরের ভাল-মন্দের উপরে ঈমান এগুলির কোন একটিকে অস্বীকার করলে কিংবা সন্দেহ পোষণ করলে সে আর মুমিন থাকে না। (২) ফিরিশতাগণ নূরের তৈরী এক বিশেষ সৃষ্টি, যারা অদৃশ্যভাবে সৃষ্টিকুলের সেবায় সর্বদা আল্লাহ্র হুকুমে নিয়োজিত রয়েছে। ফেরেশতাদের সর্দার জিব্রীল (আঃ) নবীদের নিকটে আল্লাহ্র বাণী বহনের গুরুদায়িত্ব পালন করেন। মীকাঈল (আঃ) বৃষ্টি বর্ষণের, আযরাঈল (আঃ) জান কবযের ও ইস্রাফীল (আঃ) কেয়ামতের দিন চূড়ান্ত ধ্বংসের সিংগায় ফুঁক দেওয়ার অপেক্ষায় সদা প্রস্তুত রয়েছেন। এতদ্ব্যতীত হাযারো ফেরেশতা আল্লাহ্র হুকুমে সৃষ্টির সেবায় সদা তৎপর রয়েছে। কুরআন ও হাদীছে ফেরেশতা সম্পর্কে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, সবকিছুতে বিশ্বাস রাখা ওয়াজিব। এগুলি অদৃশ্য বিষয়ক জ্ঞান। এখানে 'অহি' ব্যতীত কল্পনার কোন স্থান নেই। (৩) কেতাব সমূহের উপরে ঈমান বলতে চার খানা শ্রেষ্ঠ কেতাব ও ছহীফা সমূহের উপরে ঈমান আনা বুঝায়। কিন্তু শেষ নবীর উপরে সর্বশেষ ও পূর্ণাংগ কিতাব 'আল-কুরআন' নাযিলের পরে বিগত সকল কেতাবের হুকুম রহিত হয়ে গেছে।

(৪) রাসূলগণের প্রতি ঈমান বলতে আমাদের নবী ও তাঁর পূর্বেকার ৩১৫ জন রাসূল সহ একলক্ষ ২৪ হাযার নবীর সকলের উপরে ঈমান আনা বুঝায়। তবে শেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আগমনের পরে বিগত সকল নবীর শরীয়ত মানসূখ বা রহিত হয়ে গেছে। অন্য সকল নবী ছিলেন স্ব স্ব এলাকা ও গোত্রের নবী। কিন্তু শেষ নবী ছিলেন বিশ্ব নবী। তাঁর শরীয়ত ও বিশ্ব জনীন।

(৫) কেয়ামতে বিশ্বাস বলতে চূড়ান্ত ধ্বংসের পরে আল্লাহ্র হুকুমে পূণর্জীবন লাভ ও আল্লাহ্র সম্মুখে শেষ বিচারের সম্মুখীন হওয়া বুঝায়।

(৬) তাক্বদীর-এর ভাল-মন্দের উপরে ঈমান বলতে একথা বিশ্বাস করা বুঝায় যে, মাখলূকাত সৃষ্টির ৫০ হাযার বছর পূর্বে আল্লাহ পাক সকলের ভাগ্য লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। তবে যেহেতু বান্দা তার ভবিষ্যৎ তাক্বদীরের খবর রাখেনা, সেহেতু আল্লাহ্‌র রহমতের উপরে ভরসা রেখে পূর্ণ উদ্যমে তাদবীর বা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে। ব্যর্থতায় সে হতাশ হবেনা, সফলতায় সে আনন্দে আত্মহারা হবেনা। বরং সর্বদা সুষ্ঠু (Balanced) ও সুন্দর জীবন যাপন করবে।

ইতিপূর্বে বর্ণিত ছয়টি মৌলিক বিষয়কে হৃদয়ে বিশ্বাস ও মুখে স্বীকার করার সাথে সাথে দ্বিতীয় বিষয় হ'ল বিশ্বাস অনুযায়ী আমল করা। হৃদয়ে বিশ্বাস ও মুখে স্বীকৃতি হ'ল ঈমানের মূল এবং কর্মে বাস্তবায়ন বা আমল হ'ল শাখা।

বলাবাহুল্য প্রত্যেক মানুষ স্বীয় লালিত বিশ্বাস অনুযায়ী আমল করে থাকে। বিশ্বাস সুন্দর হ'লে আমল সুন্দর হয়। বিশ্বাসে ত্রুটি থাক্‌লে আমল ত্রুটিপূর্ণ হয়। মানুষের তৈরী বিভিন্ন ধর্ম ও মত বাদ স্ব স্ব অনুসারীদের নিকটে বিভিন্ন ধারণা ও বিশ্বাস উপস্থাপন করেছে। যার অধিকাংশ বা সবটুকুই ত্রুটিপূর্ণ।

শুধু মানুষের তৈরী ধর্মে নয়, আল্লাহ্ প্রেরিত কেতাব তওরাত ও ইঞ্জীলের অনুসারীদের মধ্যেও পরবর্তীতে বহু অলীক ধারণার সংযোজন ঘটেছে। যা ঐশী ধর্মের বিধান হিসাবে সংশ্লিষ্ট অনুসারীগণ নিষ্ঠার সাথে মেনে চলেছেন। মূল তওরাত ও ইঞ্জিলের অবর্তমানে আধুনিক খৃষ্টবাদের প্রচারিত তিন খোদার অলীক ধারণা এগুলির মধ্যে অন্যতম। তাদের অন্যতম মতবাদ অনুযায়ী 'সকল মানুষ পাপী'। এই পাপী মানব জাতিকে বাঁচাবার জন্য আল্লাহ স্বীয় পুত্র (?) ঈসা মসীহকে দুনিয়ায় পাঠিয়ে শূলে বিদ্ধ করে দুঃখ জনক মৃত্যু (?) ঘটালেন। যাতে তাঁর রক্তের বিনিময়ে ঐসকল পাপী, যারা তাঁকে আল্লাহ্‌র পুত্র ও ত্রাণ কর্তা হিসাবে বিশ্বাস করবে, তারা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পায়। আদম (আঃ) হ'তে ঈসা (আঃ) পর্যন্ত কোটি কোটি মানুষের পাপমুক্তির ব্যবস্থা না করে শুধুমাত্র ঈসার পরবর্তী ও তার মধ্যে কেবল মাত্র ঈসাকে ত্রাণ কর্তা হিসাবে বিশ্বাসী মানুষগুলির পাপ মোচনের জন্য নিষ্পাপ ঈসাকে শূলে বিদ্ধ করে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করার (?) পিছনে আল্লাহ্‌র কোন ধরণের ন্যায় বিচার কাজ করেছে জানিনা। তবে এই অলীক প্রচারণায় ভুলে অগণিত মানুষ সবকিছু বিসর্জন দিচ্ছে, এটাতো বাস্তব।

ভ্রান্ত মুসলিম ফের্কা সমূহের নিকটে ঈমানঃ

পবিত্র কুরআন অবিকৃত অবস্থায় থাকার কারণে এবং ছহীহ হাদীছ সমূহ বাছাই হয়ে সকলের সামনে এসে যাওয়ার কারণে মুসলিম উম্মাহ্‌র ঈমান আক্বীদায় বিগত উম্মতগুলির ন্যায় বিভ্রান্তির সুযোগ হয়নি। তবে আখেরী যামানায় যে অনুরূপ ঘটবে সে কথা হাদীছে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। মূলতঃ (তির, মিশ হা/১৭১)। রাজনৈতিক কারণে সৃষ্ট বিরোধগুলি পরবর্তীতে উছূলী বিতর্কে পরিণত হয় এবং এর সঙ্গে যোগ হয় শরীয়তের ব্যাখ্যাগত মতভেদ এবং গ্রীক ও ভারতীয় দর্শনের কুটতর্ক। রাজনৈতিক কারণগুলির মধ্যে প্রথম ও প্রধান ছিল হযরত আলী ও মু'আবিয়া (রাঃ)-এর মধ্যকার রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব। যার পরিণতিতে একদল হযরত আলীর দল হ'তে বেরিয়ে গিয়ে 'খারেজী' এবং অন্যদল আলীর সমর্থক হিসাবে 'শী'আ' নামে অভিহিত হয়। পরবর্তীতে তারা সবাই গত হয়ে গেলেও ঐ ফাটল টিকে থাকে ও তা ধর্মীয় বিতর্কে রূপ নেয়। ঐ দু'দলের মধ্যবর্তী নিরপেক্ষ

আরেকটি দল থাকলেন যারা 'মুর্জিয়া' নামে পরিচিত হলেন। এই ভাবে একে একে বিভিন্ন উপদলের সৃষ্টি হয়- যারা ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টি ভঙ্গি নিয়ে ঈমানের ব্যাখ্যা দিতে থাকেন। যদিও হাদীছ পন্থী ওলামায়ে কেরামের সার্বিক প্রচেষ্টায় এই সব বিভ্রান্তি বেশী দূর এগোতে পারেনি। তবুও বিভ্রান্তি আছে। যা নামে ও বেনামে আমাদের সমাজে অনেকের মধ্যে আজও প্রচলিত আছে। নিম্নে এরূপ প্রধান কয়েকটি ফের্কার ঈমানের ব্যাখ্যা দেওয়া হ'ল।

(১) খারেজীঃ- ইসলামের ইতিহাসে প্রথম বিভ্রান্ত ফের্কা খারেজী, যারা হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-এর সঙ্গে আপোস মীমাংসা প্রস্তাব সমর্থন করায় আলী (রাঃ)-এর দল থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। কেননা তাদের ধারণা মতে কেতাবুল্লাহ মওজুদ থাকতে কোন মানুষকে শালিশ হিসাবে গ্রহণ করা অন্যায় ও গুনাহে কবীরাহ। আলী ও মু'আবিয়া উভয়ে তৃতীয় পক্ষ দু'জন নেতৃস্থানীয় ছাহাবীকে শালিশ নিয়োগ করে এই অপরাধ করেছেন। অতএব তারা হত্যাযোগ্য অপরাধী। তাদের শ্লোগান ছিল-+ 'আল্লাহ ছাড়া কারও হুকুম নেই'। কথাটির জওয়াবে হযরত আলী (রাঃ) বলেছিলেন+ 'কথাটি তারা ঠিকই বলেছে কিন্তু বাতিল অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। কেননা শাসন ক্ষমতায় ভাল ও মন্দ উভয় প্রকার লোকই আসতে পারে' (আল-মিলাল১/)। সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কারণে সৃষ্ট এই দলটিতে পরে বিভিন্ন বিদ'আতী আকীদার সমাবেশ ঘটে। তারা কবীরাহ গুনাহগার ব্যক্তিকে কাফির ও চিরস্থায়ী জাহান্নামী হিসাবে গণ্য করে এবং অনুরূপ কোন গোনাহগার শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ওয়াজিব মনে করে।

এইরূপ চরমপন্থী আকীদার লোক বর্তমানে অনেক মুসলিম দেশে দেখতে পাওয়া যায়। মুসলমান হ'য়ে তারা মুসলমানের রক্তকে হালাল মনে করছে। সরকারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বা গোপনে সশস্ত্র যুদ্ধের মহড়া দিচ্ছে। সামাজিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা বিনষ্টের পায়তারা করছে।

২. শী'আঃ হযরত আলীর সমর্থক এই দলটির মধ্যে পরবর্তীতে অসংখ্য বিদ'আতী আকীদার অনুপ্রবেশ ঘটে। তাদের আকীদা মতে হযরত আলী (রাঃ) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর **'অছি'**। অতএব আলী ও তাঁর পরিবারের মধ্যেই কেয়ামত পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহ্‌র নেতৃত্ব সীমাবদ্ধ থাকবে। সেকারণ হযরত আবুবকর, ওমর ও ওছমান(রাঃ) ছিলেন তাদের দৃষ্টিতে অবৈধ খলীফা। চরমপন্থী শী'আ কিছু উপদলের নিকটে তাঁরা ছিলেন কাফির। এমনকি তারা আলীকে গৌণ অর্থে আল্লাহ্‌র মর্যাদা দেওয়ায় হযরত আলী(রাঃ) তাদেরকে জীবন্ত পুড়িয়ে মেরেছিলেন (কিতাবুল ফাছল ২/ ১১৫)।

শী'আরা পাঁচটি প্রধান দল ও বহু সংখ্যক উপদলে বিভক্ত। ইমামিয়া শী'আদের অন্যতম উপদল বারো ইমামে বিশ্বাসী 'ইছনা আশারী'গণ ইমাম খোমেনীর নেতৃত্বে একতাবদ্ধ হয়ে বর্তমানে ইরান শাসন করছে। এদের ধারণা মতে রাসূল (ছাঃ) তাঁর পরবর্তী ১২ জন নেতার নাম বলে গিয়েছিলেন। সেই হিসাবে দ্বাদশতম ইমাম মুহাম্মাদ বিন হাসান আসকারী ৪ বা ৮ বছর বয়সে তাদের বাড়ীর নীচের ঠান্ডা ঘরে লুকিয়ে যান। তিনি সত্বর আসবেন ও পৃথিবীকে ন্যায় ও কল্যাণে ভরে দিবেন। তাদের দৃষ্টিতে রাসূলের পরে আবুবকরের (রাঃ) হাতে বায়'আত করে ছাহাবীগণ মুরতাদ হয়ে গেছেন। ছাহাবীগণ কুরআনের সূরায়ে বেলায়েত (?) লুকিয়েছেন যেখানে আলীর নেতৃত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছিল। এ জন্য উম্মতের সর্ব নিকৃষ্ট ব্যক্তি হলেন আবু বকর, ওমর ও ওছমান' (আল-আদিয়ান পৃঃ ১৮১) ।

৩। মুরজিয়াঃ অর্থ বিলম্ববাদী। ওছমান ও আলীর সময়কার রাজনৈতিক গোলযোগে এরা নিরপেক্ষ ছিলেন এবং উভয় পক্ষকে মুমিন গণ্য করে তাদের স্ব স্ব আমলের হিসাব কেয়ামত পর্যন্ত পিছিয়ে দিয়েছিলেন। অন্য অর্থে যারা আমলকে ঈমান হ'তে পৃথক ভাবেন, তাদেরকে 'মুরজিয়া' বলা হয়। রাজনৈতিক কারণে সৃষ্ট হ'লেও এটিও পরে নির্দিষ্ট ধর্মীয় মতবাদে রূপ নেয়। এদের আক্বীদা অনুযায়ী মুমিন হওয়ার জন্য কেবলমাত্র বিশ্বাস ও স্বীকৃতিটুকুই যথেষ্ট, আমলের শর্ত নেই। ঈমান একটি অখন্ড বিশ্বাসের নাম। ভাল বা মন্দ আমলের প্রভাবে ঈমানের কোন হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটেনা। এই বিদ'আতী আক্বীদা পোষণের ফল হিসাবে বর্তমানে বহু মুসলমান শত অপরাধ করেও নিজেকে খাঁটি ঈমানদার বলে গর্ববোধ করে থাকে- যা ঈমানের মূল উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে দেয়।

৪। ক্বাদারিয়াঃ প্রথম শতাব্দী হিজরীর দ্বিতীয়ার্ধে ইরাকে সর্বপ্রথম তাক্বদীরকে অস্বীকার কারী ক্বাদারিয়া মতবাদের জন্ম হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এই দল সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন যে, 'এরা আমার উম্মতের মধ্যে অগ্নি উপাসকদের সমতুল্য'। অন্য বর্ণনায় 'এরা আল্লাহ্‌র সঙ্গে বিবাদকারী'(আল-মিলাল ১/৪৩)।

আজকের বিশ্বে আমাদের মধ্যে নামে- বেনামে এদের সংখ্যা কম নয়, যারা নিজেদেরকে নিজেদের ' অদৃষ্টের মালিক' বলে আত্ম প্রসাদ লাভ করতে চান।

৫। জাবরিয়াঃ ক্বাদারিয়া মতবাদের ঠিক উল্টা এই অদৃষ্টবাদী মতবাদ মানুষকে জড়পদার্থের ন্যায় মনে করে। তারা বলেন 'নিশ্চয়ই বান্দা তার নিজের কাজে বাধ্য। তার নিজস্ব কোন শক্তি, ইচ্ছা বা এখতিয়ার নেই'। এই আক্বীদার নব্য অনুসারী বহু ধর্মভীরু ভাইয়ের মুখে হর-হামেশা শোনা যায় 'কিছু হইতে কিছু হয় না, যা কিছু হয় আল্লাহ হইতে হয়'। 'আমার ইচ্ছা বলে কিচ্ছু নেই' ইত্যাদি। এই মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা জাহ্‌ম বিন ছাফওয়ান-এর নামানুসারে এদেরকে 'জাহমিয়া'ও বলা হয়। তারা বলেন, আল্লাহ নিজ সত্তায় একক ও যাবতীয় গুণাবলী হ'তে মুক্ত। আল্লাহ্‌র কালাম অন্যান্য সৃষ্টবস্তুর ন্যায় সৃষ্ট বা মাখলূক (আল-মিলাল১/৮৮)। তাদের আক্বীদা অনুযায়ী মানুষ স্বাধীনভাবে নিজ ইচ্ছা শক্তি প্রয়োগ করতে পারে না বরং আল্লাহ মানুষের মাধ্যমে স্বীয় কর্ম পরিচালনা করেন। যেমন তিনি বায়ু ও পানিকে পরিচালিত করেন। মানুষ সকল বিষয়ে মাজবুর বা জড়পদার্থের ন্যায় বাধ্য। এই ভ্রান্ত আক্বীদার পুরোধা জা'আদ বিন দিহামকে কুফার গর্ভণর খালেদ বিন আব্দুল্লাহ আল-ক্বাসারী ১২৪ হিজরীর ঈদুল আযহার দিন সকাল বেলা ঈদের ছালাত ও খুৎবার পরে নিজে হাতে যবেহ করেছিলেন।

এই অদৃষ্টবাদী আক্বীদার অনুসারী মুসলমানের সংখ্যা বর্তমানে ক্রমেই বেড়ে চলেছে। অনেকের মধ্যে সর্বেশ্বরবাদী' দর্শন ঢুকে পড়েছে এবং তারা মৃত পীর-মাশায়েখদেরকে খোদায়ী আসনে বসিয়েছেন। যেমন আজমীরের খাজা মুঈনুদ্দীনকে আল্লাহ্‌র গুণাবলীর সাথে তুলনা করে প্রার্থনা রচনা করা হয়েছে- 'রহীম মুঈনুদ্দীন, করীম মুঈনুদ্দীন, গাফ্‌ফার মুঈনুদ্দীন ইত্যাদি। তারা রাসূলকে আল্লাহ্‌র আসনে বসিয়ে ভক্তি কবিতা রচনা করেছে। যেমন,'আকার কি নিরাকার সেই রব্বানা' আহমাদ আহাদ হ'লে তবে যায় জানা ; মীমের ঐ পর্দাটিরে উঠিয়ে দেখরে মন, দেখবি সেথায় বিরাজ করে 'আহাদ' নিরঞ্জন। এদের

দর্শনে সকল সৃষ্টিতেই আল্লাহ বিরাজমান। অথচ আল্লাহ আরশে সমাসীন। তাঁর সত্তা ও বান্দার সত্তা কখনোই এক নয়।

৬। মু'তাযিলাঃ হিজরী ২য় শতকের প্রথমার্ধে সৃষ্ট এই মতবাদ অনুযায়ী মানুষের লৌকিক জ্ঞানই ভালও মন্দের চূড়ান্ত মাপকাঠি এবং বান্দাই তার কর্মের স্রষ্টা। তারা জাহমিয়াদের ন্যায় আল্লাহকে যাবতীয় গুণ হ'তে, এমনকি কথা বলার গুণ হতেও মুক্ত একটি নির্গুণ সত্তা মনে করে। সে কারণ তাদের বিশ্বাস মতে কুরআন আল্লাহ্র সরাসরি কালাম নয় বরং মাখলুক বা সৃষ্ট। তাদের মতে কবীরা গোনাহগার ব্যক্তি না কাফির, না মুমিন বরং মধ্যবর্তী স্থানে। তওবা না করে মারা গেলে সে নিশ্চিতভাবে জাহান্নামী। তবে তার শাস্তি কাফেরদের চাইতে কিছুটা হাল্কা হবে। মানুষের জ্ঞানকে ভাল-মন্দের মাপকাঠি আখ্যা দেওয়ার ফলে আল্লাহ প্ররিত অহি-র সত্যকে কোন কোন ক্ষেত্রে তারা অগ্রাহ্য করেছে। ফলে নিজ জ্ঞানের অনুকূলে না হ'লে তারা কুরআনও হাদীছের বিধানকে বিভিন্ন অজুহাতে অমান্য করতে কুণ্ঠা বোধ করে না।

৭. আশ'আরীঃ- ইমাম আবুল হাসান আশ'আরীর অনুসারী এই দল আল্লাহকে নির্গুণ সত্তা মনে করে ও মাত্র ৭টি গুণকে স্বীকার করে। যেমন- তিনি عليم সর্বজ্ঞ, قدير ক্ষমতাশালী, حيّ চির জীব, مريد ইচ্ছাকারী, متكلم কথক, سميع সর্বশ্রোতা, এবং بصير সর্বদ্রষ্টা। এরাও মু'তাযিলাদের ন্যায় মানুষের লৌকিক জ্ঞানকে অহি-র জ্ঞানের উপরে স্থান দিয়ে থাকে।

৮। মুজাস্‌সিমাহ ও মুশাব্বিহাহঃ নির্গুণবাদী জাহ্‌মিয়া ও মু'তাযিলা মতবাদের বিপরীতে কায়াবাদী ও সাদৃশ্যবাদী আর একদল বিদ্বানের মাধ্যমে এই মতবাদের জন্ম হয়। যারা আল্লাহকে সাধারণ প্রাণীদেহের সঙ্গে তুলনা করেন। (নাঊযুবিল্লাহ)

উপরোক্ত ফের্কাগুলির ঈমান এক নযরে

১. খারেজীদের নিকটে ঈমানঃ

আমল ঈমানের অবিচ্ছিন্ন অংশ। অতএব কবীরা গোনাহগার ব্যক্তি কাফের ও চিরস্থায়ী জাহান্নামী।

২.শী'আদের নিকটে ঈমানঃ

আলী (রাঃ) রাসূলের (ছাঃ) 'অছি'। অতএব রাসূলে (ছাঃ) পর থেকে কেয়ামত পর্যন্ত আলী ও তাঁর বংশের মধ্যেই মুসলিম উম্মাহ্র নেতৃত্ব সীমাবদ্ধ থাকবে।

৩. মুরজিয়াদের নিকটে ঈমানঃ

ঈমান একটি অখন্ড বিশ্বাসের নাম। অতএব কবীরা গোনাহগার মুমিন ও জিব্রীলের ঈমান সমান। আমল ঈমানের অংশ নয়।

৪. ক্বাদারিয়াদের নিকটে ঈমানঃ

এরা তাকদীরকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহকে নির্গুণ সত্তা মনে করে।

৫. জাহমিয়া ও জাবরিয়াদের নিকটে ঈমানঃ

এদের মতে আল্লাহকে চেনা ও তাঁর মা'রিফাত হাছিল করাই যথেষ্ট। এরা মানুষকে ইচ্ছাশক্তিহীন ও অদৃষ্টের পুতুল মনে করে এবং আল্লাহকে গুণহীণ সত্তা বলে ধারণা করে।

৬. মু'তাযিলাদের নিকটে ঈমানঃ

এরা আল্লাহকে নির্গুণ সত্তা মনে করে এবং কুরআনকে 'মাখলূক' বা সৃষ্ট বস্তু বলে ধারণা করে। তারা মানুষের লৌকিক জ্ঞানকে ভাল-মন্দের মাপকাঠি বলে মনে করে। এদের মতে কবীরা গোনাহগার ব্যক্তি না মুমিন, না কাফির।

তওবা না করে মারা গেলে সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে।

৭. আশ'আরিয়াদের নিকটে ঈমানঃ

এরা আল্লাহকে নির্গুণ সত্তা মনে করে। তবে মাত্র ৭টি গুণকে আল্লাহ্র জন্য নির্দিষ্ট করে। এরা মু'তাযিলাদের ন্যায় মানুষের জ্ঞানকে অহি-র জ্ঞানের উপরে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে।

৮.মুজাস্সিমাহদের নিকটে ঈমানঃ

এরা আল্লাহকে গুণযুক্ত সত্তা বলে বিশ্বাস করে এবং তাঁর সত্তাকে সাধারণ প্রাণীদেহের ন্যায় মনে করে।

ফলাফল

১. খারেজীদের ঈমান অনুযায়ী কবীরা গোনাহগার ব্যক্তি কাফের। হযরত আলী ও মু'আবিয়া (রাঃ) কেতাবুল্লাহ মওজুদ থাকতে ছাহাবী আবু মূসা আশ'আরী ও আমর বিনুল আছ (রাঃ)-কে উভয় দলের মধ্যকার রাজনৈতিক গোলযোগ মীমাংসার জন্য শালিশ নিয়োগ করে তাদের দৃষ্টিতে গোনাহে কবীরাহ করেছেন। অতএব তাঁরা কাফের ও হত্যাযোগ্য অপরাধী (নাঊযুবিল্লাহ)। উক্ত বিশ্বাস অনুযায়ী তারা হযরত আলী ও মু'আবিয়া (রাঃ) উভয়কে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয়। আলীর ক্ষেত্রে তারা সফল হয়। কিন্তু মু'আবিয়ার ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়।

আজকের মুসলিম বিশ্বেও যারা উপরোক্ত চরম পন্থী আকীদায় বিশ্বাসী, তারা স্ব স্ব দেশের কবীরা গোনাহগার ব্যক্তি ও মুসলিম সরকারকে কাফের মনে করে। তার অধীনে চাকুরী করাকে হারাম মনে করে এবং ঐ সরকারকে উৎখাতের জন্য বিভিন্ন চরম পন্থা অবলম্বন করে। ফলে সামাজিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হয়।

২. শী'আদের ঈমান অনুযায়ী আলী (রাঃ)-কে ১ম খলীফা হওয়ার সুযোগ না দেওয়ায় সকল ছাহাবী দায়ী এবং হযরত আবুবকর ও ওমর (রাঃ) উভয়ে কাফের (নাঊযুবিল্লাহ)। অতএব তাদের বর্ণিত কোন হাদীছ গ্রহণযোগ্য নয়। আলীর মর্যাদা বৃদ্ধি করতে গিয়ে তারা যেমন কুরআনে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ঘটিয়েছে, তেমনি তিন লক্ষের মত জাল হাদীছ রচনা করেছে। তাদের কথিত ইমামদের মর্যাদা রাসূলদের চাইতেও বাড়িয়ে দিয়েছে। অথচ ভক্তদের এইসব বাড়াবাড়ির সাথে হযরত আলীর কোন সম্পর্ক ছিল না (হাশা ওয়া কাল্লা)। ফলে ছাহাবীদের সুউচ্চ মর্যাদায় বিশ্বাসী সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলিম সমাজকে তারা কখনোই আপন ভাবতে পারে না।

৩. মুরজিয়াদের ঈমান অনুযায়ী হৃদয়ের বিশ্বাস বা স্বীকৃতিটুকুই যথেষ্ট। আমল ঈমানের অংশ নয় এবং আমলের কারণে ঈমানের কোন হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটেনা। ফলে এই আকীদায় বিশ্বাসী লোকেরা আমলের প্রতি বিশেষ কোন আগ্রহ বোধ করেন না। ইসলামের হারাম-হালাল, ফারায়েয-ওয়াজিবাত এদের নিকটে তেমন কোন গুরুত্ব পায়না। এই শৈথিল্যবাদী ঈমানদারের সংখ্যা বর্তমানে সবচাইতে বেশী।

৪. ক্বাদারিয়াগণের ঈমান অনুযায়ী একজন মুমিন নিজেকেই নিজের ভাগ্য বিধায়ক মনে করে। ফলে যখন সে কাংখিত ফল লাভে ব্যর্থ হয়, তখন সে হতাশাগ্রস্থ হয় এবং আত্মগ্লানির দহন জ্বালায় দগ্ধীভূত হয়। অনেক সময় সে আত্ম হণনের পথ বেছে নেয়। আল্লাহকে গুণহীন সত্তা মনে করার ফলে আল্লাহ্র নিকট থেকেও তার চাওয়া -পাওয়ার কিছুই থাকেনা।

৫. জাহমিয়া বা জাবরিয়াদের ঈমান অনুযায়ী মানুষ ইচ্ছাশক্তিহীন জড় পদার্থের ন্যায়। ফলে সে

অন্যায় করেও নিজেকে নির্দোষ ভাবে। তার ধারণা মতে । তিনি 'হাকিম হয়ে হুকুম করেন, পুলিশ হয়ে ধরেন। সর্প হয়ে দংশন করেন, ওঝা হয়ে ঝাড়েন'। তাদের ভাষায় 'তুমি যেমনে নাচাও তেমনি নাচি, পুতুলের কি দোষ'। মানুষকে এরা পুতুল ভেবেছে ও তার যাবতীয় ভাল-মন্দের দায়ভার আল্লাহ্‌র উপরে চাপিয়ে দিতে চেয়েছে। ফলে নেকীর কাজে যেমন সে উৎসাহ বোধ করে না, অন্যায় করেও তেমনি অনুতপ্ত হয়না। জাবরিয়াদের ঈমান সত্যিকার অর্থেই একজন মানুষকে নিরুত্তাপ ও নির্লিপ্ত মানুষে পরিণত করে। মা'রিফাত হাছিলের জন্য ক্বল্‌ব ছাফ করার মেহনতেই সে জীবন কাটায়। জীবন সংগ্রামে ও সভ্যতার অগ্রগতিতে তার তেমন কোন ভূমিকা থাকেনা। দুর্ভাগ্য আজকের সমাজে এদের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে এবং লোকেরা এদেরকেই সত্যিকারের ধার্মিক ভেবে নিচ্ছে।

৬. মু'তাযিলাদের ঈমান অনুযায়ী একজন মানুষ সবকিছুকে নিজের যুক্তির আলোকে বিচার করে। ফলে আল্লাহ্‌র যে সকল বিধান তার যুক্তিতে সুন্দর মনে হয় না, সেগুলিকে অমান্য করতে সে প্রলুব্ধ হয়। তাছাড়া সকল মানুষ সমান জ্ঞানের অধিকারী না হওয়ায় নিজের অজান্তেই সে অন্যের জ্ঞানের নিকটে বন্দী হয়ে পড়ে। ফলে ভাল-মন্দের নিশ্চিত কোন মানদন্ড না থাকায় সে পথভ্রষ্ট হয়। কবীরা গোনাহগার ব্যক্তি না মুমিন না কাফির হওয়ার ঘূর্ণ্যাবর্তে সে দিশেহারা হয়ে পড়ে। জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য অর্জনে সে ব্যর্থ হয়। কুরআনকে সরাসরি আল্লাহ্‌র কালাম হিসাবে বিশ্বাস না করায় সে কুরআনের ব্যাপারেও সন্দেহে পতিত হয়। ফলে অভ্রান্ত সত্যের মাপকাঠি বলে তার কাছে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। এই অতি যুক্তিবাদী মানুষটি একসময় জীবনযুদ্ধে ব্যর্থ সৈনিকের মত হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে।

৭. আশ'আরীদের ঈমান অনুযায়ী মানুষের জ্ঞান অকাট্য ও চূড়ান্ত সত্যের উৎস। এই ঈমান একজন মুসলিমকে নিশ্চিতভাবেই পথভ্রষ্ট করে। সাথে সাথে আল্লাহ্‌র গুণাবলীকে অস্বীকার করার ফলে এলাহী আনুগত্যের কোন বাস্তব প্রভাব তার জীবনে তেমন পরিদৃষ্ট হয়না।

৮. মুজাস্‌সিমাহদের ঈমান অনুযায়ী আল্লাহকে প্রাণীদেহের ন্যায় একটি স্থূল সত্তা পরিণত করা হয়েছে, যা প্রকারান্তরে মূর্তিপূজার শামিল। এটা নিতান্তই অন্যায় ও গর্হিত আকীদা। এটা নির্গুণবাদীদের বিরুদ্ধে একটি চরমপন্থী কায়াবাদী আকীদা বৈ কিছুই নয়।

জাহমিয়া ক্বাদারিয়া , জাবরিয়া, মু'তাযিলা, আশ'আরিয়া- এরা সকলেই আল্লাহকে গুণহীণ সত্তা মনে করার ফলে এক কথায় মু'আত্তিলাহ বা নির্গুণবাদী বলে পরিচিত।

আহলে সুন্নাত-এর ঈমান ও অন্যদের সাথে তাদের পার্থক্য

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত আহলেহাদীছের নিকটে গৃহীত ঈমান-এর সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা ইতিপূর্বেই প্রদত্ত্ব হয়েছে। এক্ষণে অন্যদের সঙ্গে তাদের পার্থক্য সংক্ষেপে এই যে, তারা বিশ্বাস ও স্বীকৃতিকে ঈমানের মূল এবং আমলকে ঈমানের শাখা মনে করে ও তারা ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধিতে বিশ্বাস করে। তাদের নিকটে কবীরা গোনাহগার মুমিন ত্রুটিযুক্ত ঈমানদার বা 'মুমিনে নাক্বিছ' কিন্তু কাফির নয়। সে মুমিনও নয় কাফিরও নয়- এমন ঝুলন্ত অবস্থায়ও নয়। ঈমানের প্রকাশ্য স্বীকৃতি দানকারী কোন ব্যক্তির জান, মাল ও ইয্‌যত শারঈ কারণ ব্যতীত কারু জন্য হালাল নয়। কবীরা

গোনাহগার মুমিন তওবা না করে মারা গেলেও সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী নয়। আল্লাহ্‌র নামও গুণাবলীর ক্ষেত্রে তারা নির্গুণবাদী মু'আত্তিলাহ ও সাদৃশ্যবাদী মুজাস্‌সিমাহ ও মুশাব্‌বিহাহদের মধ্যবর্তী ঈমান পোষণ করেন। তারা আল্লাহ্‌র আকার আছে বলে বিশ্বাস করে। কিন্তু তা কারু সাথে তুলনীয় নয়। তারা আমল ঈমানের অংশ হওয়ার ক্ষেত্রে চরমপন্থী খারেজী ও মুর্জিয়াদের মধ্যবর্তী ঈমান পোষণ করে। তাঁরা অবশ্যই আল্লাহকে নাম ও গুণযুক্ত সত্তা মনে করে। তবে সেই সত্তা ও গুণাবলী বান্দার সত্তা ও গুণাবলীর সাথে তুলনীয় নয়। তারা অদৃষ্টবাদী নয় বা তাকদীরকে অস্বীকারকারীও নয়। বরং তাকদীর না জানার কারণে তাকদীরের ভাল-মন্দের উপরে আস্থা রেখে পূর্ণ উদ্যমে প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়। ফলে ব্যর্থতায় সে ধৈর্য হারায় না। সফলতায় সে আত্মহারা হয়না। নিজের জ্ঞানকে সে অহি-র জ্ঞান ভান্ডারের ঊর্ধে মনে করে না। বরং আল্লাহ্‌র অহিকেই সে অভ্রান্ত সত্যের চূড়ান্ত উৎস বলে বিশ্বাস করে ও নিজের জ্ঞানকে অহি-র জ্ঞানের কাছে সমর্পণ করে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়। দৃঢ় ঈমান ও নেক আমলকেই সে জান্নাত লাভের প্রধান অসীলা বলে মনে করে।

এক্ষণে (১) ঈমান যখন আমল ছাড়া হয়, তখন সেই ঈমান হ'ল ইবলীসের ঈমানের ন্যায়। কেননা ইবলীসও আল্লাহকে স্বীকৃতি দিয়ে বলেছিল- 'যেহেতু তুমি আমাকে বিভ্রান্ত করেছ, সেহেতু আমি মানুষকে বাধা দেওয়ার জন্য তোমার ছিরাতে মুস্তাকীম-এর উপরে বসে থাকব' (আ'রাফ১৬)। (২) আনুগত্যহীন ঈমান আবুজাহ্‌লের ঈমানের ন্যায়। কেননা সেও বদরের যুদ্ধে রওয়ানার সময় তার সাথীদের নিয়ে কা'বা ঘরে গিয়ে দো'আ করেছিল- 'হে আল্লাহ! আমাদের উভয় দলের মধ্যে যে দল সম্পর্ক ছিন্নকারী ও আত্মীয়তা বিনষ্টকারী তাকে তুমি আজ ধ্বংস করে দাও। হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যে যে দল অধিক অতিথিসেবী, অধিক আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী ও অধিক মযলুমকে মুক্তকারী-তাকে তুমি সাহায্য কর, হে আল্লাহ! যদি মুহাম্মাদ হক- এর উপরে থাকে, তবে তুমি তাকে সাহায্য কর !!' আর যদি আমরা হকের উপরে থাকি তবে আমাদেরকে সাহায্য কর!!' এখানে আবু জাহ্‌লের দো'আর মধ্যে আন্তরিকতা থাক্‌লেও রাসূলের প্রতি আনুগত্য না থাকায় তা কবুল হয়নি। (৩) ঈমান যখন আমল ছাড়া কেবল স্বীকৃতির নাম হবে, তখন তা হবে কুফরীর এক দর্জা নীচে। যেমন জাহমিয়া ও মুর্জিয়াদের ঈমান।

(৪) ঈমান আছে, আমল আছে কিন্তু নিয়ত ঠিক নেই, সেটা হ'ল 'নিফাক'। যেমন মুনাফিক সর্দার আব্দুল্লাহ বিন উবাই, আব্দুল্লাহ বিন সাবা প্রমুখদের ঈমান।

(৫) ঈমান, আমল, নিয়ত সবই ঠিক আছে, কিন্তু সুন্নাতী তরীকার উপরে নয়। সেটা হ'ল বিদ'আত। আর বিদ'আতীর সকল আমল বরবাদ।

এক্ষণে কবীরা গোনাহগার ব্যক্তি খারেজীদের নিকটে কাফের ও চিরস্থায়ী জাহান্নামী। তাদের জান, মাল ও ইয্‌যত সবই হালাল। মুর্জিয়াদের নিকটে সে পূর্ণ মুমিন বা 'মুমিনে কামিল'। মু'তাযিলাদের নিকটে সে 'মুমিন ও কাফিরের মধ্যবর্তী স্থানে' এবং সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী। তবে তার শাস্তি কিছুটা হাল্‌কা হবে। আহলেসুন্নাত আহলেহাদীছের নিকটে ঐ ব্যক্তি 'ত্রুটি যুক্ত মুমিন'। সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী নয়। ঘুমন্ত ব্যক্তি ঘুমের কারণে যেরূপ মৃত নয়, তেমনি কবীরা গোনাহগার ব্যক্তি গোনাহের কারণে ঈমান শূন্য বা কাফির নয়। প্রকাশ্যে ঈমান-এর স্বীকৃতি দানের ফলে আহলে সুন্নাত-এর নিকটে শারঈ কারণ ব্যতীত সকল মুসলমানের জান, মাল ও ইয্‌যত হারাম।

ফলাফল

আহলে সুন্নাত-এর ঈমান-এর বাস্তব ফল এই যে, কলেমাগো সকল মুসলমানের প্রতি তার হৃদয় খোলাছা থাকে। প্রতি মুহূর্তে সে অধিকতর ভাল মুমিন হওয়ার চেষ্টা করে। নিজেকে সে যেমন গোনাহ থেকে বিরত রাখে, অন্য ভাইকেও তেমনি দীনের পথে আনতে যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালায়। তাক্বদীরের ভাল-মন্দের উপরে দৃঢ় বিশ্বাস থাকার কারণে সে সুষ্ঠু ও নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করে। সাময়িক দুর্বলতার ফলে কবীরা গোনাহ করে ফেললেও সে তওবা করে ও অনুতপ্ত হয়। আল্লাহ্‌র নিকটে ক্ষমা ভিক্ষা করে। সে কোন অবস্থায় আল্লাহ্‌র রহমত ও মাগফেরাত থেকে নিরাশ হয়না। হতাশায় ভেঙ্গে পড়েনা। বরং সর্বদা আল্লাহ্‌র উপরে ভরসা রেখে জীবনযুদ্ধে সম্মুখপানে এগিয়ে চলে। এই ঈমানের ফলে সমাজ উন্নতি ও অগ্রগতির পথে ধাবিত হয়।

ঈমানের স্বাদ

হযরত আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, তিনটি বস্তু যার মধ্যে আছে, সে ঈমানের স্বাদ পেয়েছে। ১-যার নিকটে সবকিছুর চাইতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সর্বাধিক প্রিয় ২- যে ব্যক্তি

কাউকে ভালবাসে স্রেফ আল্লাহকে খুশী করার জন্য ৩- যে কুফরী থেকে সে মুক্তি পেয়েছে, সেই কুফরীতে ফেরত যাওয়াকে যে ব্যক্তি ঐরূপ অপসন্দ করে যেরূপ সে আগুণে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে অপসন্দ করে' (বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৮)। হযরত আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, ঐ ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ পেয়েছে, যে ব্যক্তি প্রতিপালক হিসাবে আল্লাহ্র উপরে, দীন হিসাবে ইসলামের উপরে এবং রাসূল হিসাবে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপরে রাযী হয়ে গেছে'।-মুসলিম, মিশকাত হা/৯।

ঈমানের স্বাদ বলতে উপরে যে বিষয়গুলি বর্ণিত হয়েছে, তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একজন মুমিন ব্যক্তি হেদায়াতের আলোর পথ ছেড়ে কখনোই কুফরীর অন্ধগলিতে প্রবেশ করতে পারেনা। তেমনি আল্লাহ প্রেরিত জান্নাতী জীবন বিধান ইসলামী শরীয়ত লাভের পর সে মানবরচিত কোন বিধান ও মতবাদকে গ্রহণ করতে পারেনা। একইভাবে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সকল বিষয়ে সর্বোত্তম আদর্শ মানব হিসাবে পাওয়ার পরে সে জীবনের বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন ব্যক্তিকে নমুনা হিসাবে গ্রহণ করতে পারেনা। যদি অন্যকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে,তবে বুঝতে হবে যে, ঈমানের স্বাদ লাভে সে ব্যর্থ হয়েছে।

ঈমানের হাক্বীকত

সর্বাধিক হাদীছজ্ঞ ছাহাবী হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর শিষ্য খ্যাতনামা তাবেঈ হযরত ওহাব বিন মুনাব্বিহ (রাঃ) বলেন, কোন ব্যক্তি ঈমানের হাক্বীকত বা মূল বিষয়ে পৌঁছতে পারবে না, যতক্ষণ না তার মধ্যে ১০টি অভ্যাস সৃষ্টি হবে। (১) সর্বদা হেদায়াতের আকাংখী হবে (২) অহংকার হ'তে বিরত থাকবে (৩) ইয্যত পাওয়ার চেয়ে বিনয়ী হওয়াকে অধিক প্রিয় মনে করবে (৪) প্রাচুর্যের চেয়ে দারিদ্র অধিকতর প্রিয় হবে (৫) নিজের অধিক নেকীর কাজকে সর্বদা কম মনে করবে (৬) অন্যের কম নেকীর কাজকে সর্বদা অধিক মনে করবে (৭) কোন প্রার্থীকে খারাব মনে করবে না (৮) জীবনের শেষদিন পর্যন্ত জ্ঞানার্জনে ব্যাপৃত থাকবে (৯) বেঁচে থাকার মত রুযি অধিকতর প্রিয় হবে উদ্বৃত্ত রুযির চেয়ে (১০) ঘর থেকে বের হয়ে সকলকে নিজের চেয়ে উত্তম মনে করবে।

ঈমান ও ইসলাম

'ঈমান' যখন ইসলাম-এর সাথে একত্রে উল্লেখিত হবে, তখন ঈমান অর্থ হবে হৃদয়ের বিশ্বাস এবং ইসলাম-এর অর্থ হবে বাহ্যিক নেক আমল সমূহ। যেমন (১) 'হাদীছে জিব্রীল'-য়ে বর্ণিত হয়েছে (মিশকাত হা/২)। (২) যেমন আল্লাহ বলেছেন, 'নিশ্চয়ই মুসলিম পুরুষ ও নারী, মুমিন পুরুষ ও নারী'... (আহযাব ৩৫)। (৩) 'বেদুঈন গণ বলে যে, আমরা ঈমান এনেছি। আপনি বলুন যে, তোমরা ঈমান আনোনি। বরং তোমরা বলো যে, আমরা ইসলাম কবুল করেছি' (হুজুরাত ১৪)।

পক্ষান্তরে যখন 'ঈমান' এককভাবে উল্লেখিত হবে, তখন তার মধ্যে ইসলাম ও বাহ্যিক আমল সমূহ প্রবেশ করবে। যেমন (১) আল্লাহ বলেন- 'নিশ্চয়ই মুমিন তারাই.....(আনফাল ২-৪ আয়াত)। (২) 'হাদীছে শি'আব'-য়ে বলা হয়েছে, 'ঈমানের সত্তুরের অধিক শাখা রয়েছে। যার সর্বোত্তম শাখা হ'ল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং সর্বনিম্ন শাখা হ'ল রাস্তা হ'তে কষ্ট দূর করা' (বু, মু, মিশকাত হা/৫)।

উপসংহার

ঈমান-এর সঠিক অর্থ ও তাৎপর্য উপলব্ধি করা প্রত্যেক মুমিনের জন্য অপরিহার্য। কেননা ইসলামে প্রথম যে খারেজী ফিৎনার উদ্ভব হয়, তা কেবল ঈমানের ভুল ব্যাখ্যার কারণেই হয়। হযরত আলীর মাথায় অস্ত্রাঘাত করার পরে হত্যাকারী ইবনু মুলজাম বলেছিল, 'আমি আল্লাহ্র নিকটে প্রার্থনা করেছিলাম যে, আমার এই অস্ত্র দ্বারা আমি আল্লাহ্র নিকৃষ্টতম সৃষ্টিকে (আলীকে) হত্যা করব' (আল-বেদায়াহ ৭/৩৩৯)। অর্থাৎ এতবড় পাপ করার পরেও সে সামান্যতম অনুতপ্ত হয়নি, তার ভুল আক্বীদার কারণে। পরবর্তীতেও মুসলিম খেলাফত সমূহে যত ফিৎনা হয়েছে, তার অধিকাংশ ঈমানী ভুল ব্যাখ্যার কারণে হয়েছে। উমাইয়া যুগে খারেজী ও শী'আদের অপতৎপরতা, আব্বাসী যুগে মু'তাযিলা ফিৎনা ও আহলে সুন্নাতের ইমামগণের উপরে নেমে আসা রাষ্ট্রীয় গযব, অবশেষে শী'আ-সুন্নী দ্বন্দ্বে আব্বাসীয় খেলাফতের বিধ্বস্তি, সবকিছুর মূল কারণ ছিল আক্বীদাগত বিভ্রান্তি ও সেই সাথে যোগ হয়েছিল হীন দুনিয়াবী স্বার্থ। আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন এবং ঈমানের সঠিক বুঝ হাছিল করার তওফীক দান করুন। আমীন!!

ব্যাপৃত থাকবে (৯) বেঁচে থাকার মত রুযি অধিকতর প্রিয় হবে উদ্বৃত্ত রুযির চেয়ে (১০) ঘর থেকে বের হয়ে সকলকে নিজের চেয়ে উত্তম মনে করবে।

ঈমানও ইসলাম

'ঈমান' যখন ইসলাম-এর সাথে একত্রে উল্লেখিত হবে, তখন ঈমান অর্থ হবে হৃদয়ের বিশ্বাস এবং ইসলাম-এর অর্থ হবে বাহ্যিক নেক আমল সমূহ। যেমন (১) 'হাদীছে জিব্রীল'-য়ে বর্ণিত হয়েছে (মিশকাত হা/২)।

(২) যেমন আল্লাহ বলেছেন, 'নিশ্চয়ই মুসলিম পুরুষ ও নারী, মুমিন পুরুষ ও নারী'... (আহাযাব ৩৫)। (৩) 'বেদুঈন গণ বলে যে, আমরা ঈমান এনেছি। আপনি বলুন যে, তোমরা ঈমান আনোনি। বরং তোমরা বলো যে, আমরা ইসলাম কবুল করেছি' (হুজুরাত ১৪)।

পক্ষান্তরে যখন 'ঈমান' এককভাবে উল্লেখিত হবে, তখন তার মধ্যে ইসলাম ও বাহ্যিক আমল সমূহ প্রবেশ করবে। যেমন (১) আল্লাহ বলেন- 'নিশ্চয়ই মুমিন তারাই.....(আনফাল ২-৪ আয়াত)।

(২) 'হাদীছে শি'আব'-য়ে বলা হয়েছে, 'ঈমানের সত্তুরের অধিক শাখা রয়েছে। যার সর্বোত্তম শাখা হ'ল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং সর্বনিম্ন শাখা হ'ল রাস্তা হ'তে কষ্ট দূর করা' (বু, মু, মিশকাত হা/৫)।

উপসংহার

ঈমান-এর সঠিক অর্থ ও তাৎপর্য উপলব্ধি করা প্রত্যেক মুমিনের জন্য অপরিহার্য। কেননা ইসলামে প্রথম যে খারেজী ফিৎনার উদ্ভব হয়, তা কেবল ঈমানের ভুল ব্যাখ্যার কারণেই হয়। হযরত আলীর মাথায় অস্ত্রাঘাত করার পরে হত্যাকারী ইবনু মুলজাম বলেছিল, 'আমি আল্লাহ্র নিকটে প্রার্থনা করেছিলাম যে, আমার এই অস্ত্র দ্বারা আমি আল্লাহ্র নিকৃষ্টতম সৃষ্টিকে (আলীকে) হত্যা করব' (আল-বেদায়াহ ৭/৩৩৯)। অর্থাৎ এতবড় পাপ করার পরেও সে সামান্যতম অনুতপ্ত হয়নি, তার ভুল আকীদার কারণে। পরবর্তীতেও মুসলিম খেলাফত সমূহে যত ফিৎনা হয়েছে, তার অধিকাংশ ঈমানী ভুল ব্যাখ্যার কারণে হয়েছে। উমাইয়া যুগে খারেজী ও শী'আদের অপতৎপরতা, আব্বাসী যুগে মু'তাযিলা ফিৎনা ও আহলে সুন্নাতের ইমামগণের উপরে নেমে আসা রাষ্ট্রীয় গযব, অবশেষে শী'আ-সুন্নী দ্বন্দ্বে আব্বাসীয় খেলাফতের বিধ্বস্তি, সবকিছুর মূল কারণ ছিল আকীদাগত বিভ্রান্তি ও সেই সাথে যোগ হয়েছিল হীন দুনিয়াবী স্বার্থ। আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন এবং ঈমানের সঠিক বুঝ হাছিল করার তওফীক দান করুন। আমীন!!

পবিত্র কুরআন এবং সহীহ হাদীসের অগ্রাধিকার নিঃশর্তভাবে মেনে নেওয়াই
মুসলিম ঐক্যের পূর্বশর্ত

-অধ্যক্ষ মুহাম্মাদ আব্দুস সামাদ

ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্ভেজাল তওহীদের মূলমন্ত্রে মুসলিম জগতকে একটি ঐক্যবদ্ধ মহাজাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। সাম্য ও ভ্রাতৃত্বই ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। সার্থক, সহজ, সুন্দর, সুসংহত ও সুনিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন করে তিনি যে আদর্শ স্থাপন করে গেছেন তা তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক। তিনি ছিলেন একজন জাগতিক ও আধ্যাত্মিক নির্মাতা। তিনি গঠন করেছিলেন একটি সুসংহত মুসলিম উম্মাহ এবং একটি বিশাল সাম্রাজ্য। তাঁর জীবনালেখ্য স্থান ও কালের দূরত্বকে ম্লান করে দিয়েছে। তাঁর জীবনাদর্শ সর্বকালের সব ধরণের লোকের জন্যই উপযোগী এবং গ্রহণযোগ্য।

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সঃ ছিলেন মহাজাতির মহা নায়ক। সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে তিনি মুসলিম জনতাকে ঐক্যবদ্ধ ও সুসংহত করে গড়ে তুলে ছিলেন। তিনিই সর্ব প্রথম রক্ত অথবা বংশ কৌলিন্যের পরিবর্তে ধর্মীয় আদর্শের ভিত্তিতে জাতি গঠন করেছিলেন। তিনি ছিলেন বিশ্ব শান্তির পথিকৃৎ। সহিষ্ণুতা, মহানুভবতা এবং শান্তির বাণী তাঁর জীবনের কার্য্যাবলীকে সার্থক করে তুলেছিল। জাতি, ধর্ম, ভাষা, বর্ণ নির্বিশেষে তিনি যে ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করেছিলেন, তাতে তাঁর অসম সাহসিকতা এবং অনুপম দূরদার্শিতার পরিচয় বহন করে।

নবুওত ও খেলাফতের সূবর্ণ যুগে মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও সংহতি সুরক্ষিত ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে ক্রমান্বয়ে সেই ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট হতে শুরু করে। হিজরী চতুর্থ শতাব্দীতে মুসলিম উম্মাহ দলে দলে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে । ইফ্তেরাকে উম্মতের মর্মান্তিক ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে চিন্তাশীল মাত্রই উদ্বিগ্ন হতে বাধ্য। নিছক জাহেলী রীতির অন্ধ অনুকরণ জনিত তকলীদের ভিত্তিতে মুসলিম উম্মাহ বিভিন্ন মতে ও পথে বিভক্ত হয়ে গেছে। তকলীদ মূলতঃ একটি নিছক জাহেলী রীতি। তকলীদী রীতির উচ্ছেদ সাধন করে অভ্রান্ত সত্যের উৎস ওহীর আদর্শ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনই ছিল রসূলুল্লাহ (সঃ) র মিশন ও প্রচার অভিযানের কার্য্যক্রম। তকলীদের বিভ্রান্তির বেড়াজালে মুসলিম উম্মাহ বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) র প্রতিষ্ঠিত ঐক্যবদ্ধ ও সুসংহত মহাজাতি উম্মতে মুসলিমার সুদৃঢ় সৌধ সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে আজ মুসলিম জাতি অধঃপতনের অতলতলে তলিয়ে যাচ্ছে। অনৈসলামিক শক্তিগুলো এতে কৌশলগত ভাবে কর্ম তৎপর হয়ে উঠেছে। ইসলামের নবী যেখানে মুসলিম জনগণের সমন্বয়ে একটি মহাজাতি গঠন করেছিলেন সেখানে আজ তারা তাদের জাতীয় ঐক্য হারিয়ে উদ্ভ্রান্ত পথিকের মত দিশেহারা হয়ে পড়েছে। তাদের হারানো ঐক্য ও সংহতি পুনরুদ্ধারের চিন্তা ও চেতনা সুধী মহলে অনেকের মনে জাগ্রত হলেও তা বাস্তবায়িত হওয়ার কোন রূপ লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। আসলে মুসলিম ঐক্যের পূর্ব শর্তই হচ্ছে অভ্রান্ত সত্যের উৎস আল্লাহ্‌র ওহী তথা পবিত্র কুরআন এবং সহীহ হাদীসের অগ্রাধিকারকে নিঃশর্তভাবে মেনে নেয়া। যতক্ষন না আমরা কুরআনও সহীহ হাদীসের সনিষ্ঠ অনুসরণের মাধ্যমে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠায়

কর্মতৎপর হয়ে উঠতে পারবো, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা সাফল্যজনকভাবে আমাদের জাতীয় ঐক্য পুণরুদ্ধারে সক্ষম হবো না।

ঐক্য ও সংহতি সকলের কাছেই পছন্দনীয় এবং তা সকলেরই কাম্য। এতে কেউ দ্বিমত করার নেই। এতদ্সত্ত্বেও বিশ্ব মানব সমাজে বিশেষ করে মুসলিম জনসমাজে আজ অসংখ্য দল- উপদলের সৃষ্টি হয়ে গেছে। বর্তমানে বিবাদ-বিসম্বাদের এমন এক কর্মধারা অব্যাহত গতিতে চলছে, যাতে সঠিক অর্থে ঐক্য ও সংহতি কল্প কাহিনীতে পর্য্যবসিত হতে চলেছে। কোন মানুষের মস্তিষ্ক প্রসূত ব্যবস্থা ও পরিকল্পনা জনগণের উপর চাপিয়ে দিয়ে তাদের ঐক্যের আশা করা দূরাশা ও আত্ম প্রবঞ্চনা মাত্র। তবে বিশ্বজাহানের প্রতিপালক মহান আল্লাহ প্রদত্ত ব্যবস্থা ও পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমেই সুসংহত ও ঐক্যবদ্ধ হওয়া সম্ভব। বস্তুতঃ মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ও সহীহ হাদীসের মূলনীতি পরিত্যাগ করার কারণেই আজ সমগ্র মুসলিম সমাজ তাদের জাতীয় ঐক্য হারিয়ে শতধাবিভক্ত হয়ে ধ্বংসের পথে ধাবমান।

মহাগ্রন্থ আল্-কুরআন এবং সহীহ হাদীসের সরাসরি অনুসরণের মাধ্যমেই তকলীদের অভিশাপ থেকে মুক্তি লাভ করা সম্ভব। আসলে ইসলাম সর্বশ্রেণীর সকল মুসলিমকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করার মহান নীতি অবলম্বন করেছে। কিন্তু তকলীদ ইসলামের এই সুন্দরতম বন্ধনকে বিনষ্ট করে এবং তকলীদের প্রভাবে মুকাল্লিদরা পরস্পরের দুশমন হয়ে দেখা দেয়। তাদের পরস্পরের প্রতি হিংসা বিদ্বেষ একান্তই অবাঞ্ছনীয়। ফলে এক মযহাবের অনুসারী মুকাল্লিদ অন্য মযহাবের অনুসারী মুকাল্লিদের পেছনে সালাত আদায় করতেও সন্দিগ্ধ। এক মযহাব পরিহার করে অন্য মযহাব অবলম্বন করলে দন্ডের বিধানও রয়েছে এবং এক মযহাবের মুকাল্লিদ অন্য মযহাবের মুকাল্লিদকে লা'নতও করে থাকে। বিশ্ব মানব-ধর্ম ইসলাম অশান্ত ও বিভ্রান্ত মানবতার জন্য একটি সঠিক পথ নির্দেশনা। কুরআন ও সহীহ হাদীসের ভাষায় ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। ইসলাম ইহলৌকিক কল্যাণ এবং পারলৌকিক মুক্তির পথে একটি সুনিশ্চিত পাথেয়। ইসলামের সুমহান ছায়াতলে আশ্রয় নিয়ে মরুবাসী আরবদের সকল নৈরাজ্যজনক অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছিল। ইসলামের সংস্পর্শে এসে অশান্ত মানব সমাজ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল। সেই ইসলাম আজো আমাদের মাঝে বিদ্যমান। কিন্তু আমাদের সমাজে শান্তি নেই। আমাদের সমাজের সর্বস্তরে জাহেলীয়াতের বিষ সংক্রমিত। আমাদের সমাজে বিবাদ বিসম্বাদের ঢেউ উত্তাল হয়ে উঠেছে। এর কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে সনাতন যুগের মরু আরবরা নিজেদেরকে সম্পূর্ণ রূপে ইসলামের পথে সঁপে দিয়েছিল। তারা তাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সকল প্রকার সমস্যার সমাধান কেবলমাত্র ইসলাম থেকেই গ্রহণ করত। কিন্তু এ যুগের মুসলিম জনগণ তাদের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন দিকে ছুটে যাচ্ছে যার পরিণাম মারাত্মক হয়ে দেখা দিয়েছে।

মহাগ্রন্থ কুরআনে সূরা আলে ইমরানের ১০৩ নং আয়াতে পারস্পরিক ঐক্যের বিষয়টি অত্যন্ত সাবলীল ও সহজবোধ্য ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে। এতে মুসলিম জনতাকে পরস্পর ঐক্য ও সংহতির বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ প্রদত্ত পূর্ণাঙ্গ ইসলামী জীবন বিধান মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ও সহীহ হাদীসকে

জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাস্তবায়িত তথা পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসকে শর্তহীনভাবে অগ্রাধিকার দিয়ে মেনে নিলে আজো মুসলিম জনতা পরস্পর ঐক্যবদ্ধ হয়ে সুশৃংখল ও সুসংহত একটি মহা জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারবে। এতে কোনই সন্দেহের অবকাশ নেই।

একমাত্র ইসলাম তথা পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসের ভিত্তিতেই ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠা সম্ভব। ঐক্যের একটি বিশেষ কেন্দ্র বা ভিত্তি থাকতেই হবে। বংশ, গোত্র, বর্ণ, ভাষা, ভৌগলিক সীমা রেখা প্রভৃতির ভিত্তিতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে ঐক্যের ভিত্তি স্থাপিত হলেও মুসলিম সমাজের ঐক্যের ভিত্তি কুরআন ও সহীহ হাদীস ভিত্তিক নির্ভেজাল ইসলামী ব্যবস্থার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। মুসলিম সমাজের জাতীয় ও সমষ্টিগত জীবনের শক্তিশালী ঐক্য সম্পর্ক পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসের নিঃশর্ত অনুসরণের মধ্য দিয়েই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। তাদের এই ঐক্য সম্পর্ককে স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে তারা অবশ্যই পরস্পরকে পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসের নির্দেশ মুতাবিক সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে বারণ করার গুরু দায়িত্ব পালন করে যাবে।

ইসলামের সুবর্ণ যুগের মুসলিম জনতা কল্যাণের প্রতি আহবান, সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে বারণ করার মহান লক্ষ্য নিয়ে যাত্রা শুরু করে অল্প দিনের মধ্যে গোটা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করে ছিলেন। তাঁরা তাঁদের ঐক্য ও সংহতির প্রভাবে রোম ও পারস্যের বিশাল সাম্রাজ্য পদানত করতে পেরেছিলেন। সমগ্র জাহানকে তাঁরা নৈতিকতা ও পবিত্রতা শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং সৎকর্ম সম্পাদন ও সংযমশীলতার উজ্জ্বল মশাল জ্বালিয়েছিলেন। সম্প্রতি 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' পূর্ব সূরীদের আদর্শের অনুসরণে পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসের অগ্রাধিকার নিঃশর্তভাবে মেনে নিয়ে মুসলিম ঐক্য ও সংহতি পুণরুদ্ধারের প্রতি মুসলিম জনসাধারণকে উদাত্ত আহবান জানাচ্ছে। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর পক্ষ থেকে আমরা সকল জাতীয় ইস্যু এবং সামগ্রিক ইসলামী স্বার্থে সকল ইসলামী দলকে যাবতীয় সংকীর্ণতার উর্ধে অবস্থান করে ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা ও সমন্বিত কর্মসূচী গ্রহণের আহবান জানাচ্ছি। আল্লাহ আমাদের সকলকে পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ ও সুসংহত জীবন যাপন করার তওফীক দান করুন। আমীন!!

আল্লামা ইউসুফ আলীর শেষ জীবনের
মর্মন্তুদ কাহিনী

মূলঃ জাভেদ হোসেন

অনুবাদঃ আব্দুল ওয়াজেদ সালাফী

সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ *পবিত্র কুরআনের খ্যাতনামা ইংরেজী অনুবাদক আল্লামা আব্দুল্লাহ ইউসুফ আলী (১৮৭২-১৯৫৩) বোম্বাইয়ের জনৈক 'বোহরা' ধর্মপ্রাণ ব্যবসায়ীর ঘরে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি সর্ব প্রথমে ছেলেকে কুরআনের হাফেয করেন। ছেলে যেদিন হাফেয হওয়ার সনদ প্রাপ্ত হয়, সেদিন পিতা আড়ম্বর পূর্ণ এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন,যাতে ছেলের অন্তরে কুরআনের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য রেখাপাত করে। পরবর্তীতে আধুনিক শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হ'লেও এবং লন্ডনে দীর্ঘদিন অতিবাহিত করলেও আব্দুল্লাহ দৈনিক কুরআন তেলাওয়াতে অভ্যস্ত ছিলেন। কুরআনের মহববত তাঁর অন্তরে এমনভাবে প্রোথিত হয়েছিল যে, সর্বদা কুরআনের বিগত ও আধুনিক যুগের তাফসীর সমূহ পড়াশুনা করতেন ও ইসলামের উপরে পান্ডিত্য পূর্ণ প্রবন্ধ সমূহ বিভিন্ন উচ্চাঙ্গের পত্রিকায় প্রকাশ করতেন। অতঃপর তিনি দেশে ফিরে আসেন ও পাকিস্তানের লাহোর মহানগরীতে বসবাস শুরু করেন। সেখানে তিনি ইসলামিয়া কলেজের ডীন নিযুক্ত হন ও*

কুরআনের ইংরেজী অনুবাদ শুরু করেন। পরবর্তীতে তাঁর অনুদিত কুরআন শরীফ আমেকিার 'আমানা কর্পোরেশন' প্রকাশ করে এবং আরও পরে সঊদী বাদশাহ ফাহদ উহা প্রকাশ ও বিতরণ করেন। প্রকাশ থাকে যে, তাঁর এই মূল্যবান তাফসীরের স্বত্ত্বাধিকার তিনি সংরক্ষিত রাখেননি। ফলে বিশ্বের যে কেউ এ তাফসীর ছেপে প্রকাশ করতে পারেন। - সম্পাদক।

আল্লামা আব্দুল্লাহ ইউসুফ আলী যাঁর ইংরেজী তরজমা কুরআন মজীদ সারাবিশ্বে কোটি কোটি মানুষের মনে সাড়া জাগিয়েছিল, সেই খ্যাতিমান জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তির শেষ জীবনের দিনগুলি নিদারুন কষ্টে নিঃস্ব, নিঃসম্বল, দীন দুঃখীর মত কেটেছিল, শেষ জীবনে হতাশা, নিঃসঙ্গতা ও যন্ত্রনাদায়ক এক করুণ অবস্থায় পতিত হয়ে অজ্ঞাত পথিকের মত তিনি মৃত্যু বরণ করেন। সেই বেদনা-বিধুর কাহিনী কুয়ালালামপুর মালয়েশিয়ার ইসলামিক বুক ট্রাষ্ট একটি বই অকারে বের করেছে।

বইটির নাম উর্দুতে " তাস্‌কীন কী তালাশ" অর্থাৎ (শান্তি অন্বেষণ)। কুরআন মজীদের ইংরেজী অনুবাদক ও মুফাস্‌সের আল্লামা আব্দুল্লাহ্ ইউসুফ আলীর জীবন কথা বইটিতে লিপিবদ্ধ। পুস্তকটি লিখেছেন জনাব এম, এ, শরীফ। পুস্তকের কিছু অংশ আমেরিকার 'মিনারেট' নামক পত্রিকায় ছাপা হয়।

আব্দুল্লাহ ইউসুফ আলী প্রকৃতই বিশ্বের একজন কুরআন মজীদের শ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে সুপরিচিত অনুবাদক। তিনি অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গে তার টীকা ও ব্যাখ্যা সুন্দর ভাবে লিখেছেন। তাঁর কুরআনের তরজমার তিনটি বৈশিষ্ট্য তাঁকে বিশ্বে সবচেয়ে অধিক সুপরিচিত করেছে। প্রথমতঃ তাঁর ইংরেজী অনুবাদ ইংরেজী ভাষার উপরে আশ্চর্য জনক ভাবে দক্ষতা প্রমান করেছে। এতে যে ব্যক্তি শুধু প্রকাশ ও বর্ণনাতে তৃপ্ত হতে চান তার জন্য কুরআন খানি একটি আকর্ষণীয় বটে। দ্বিতীয়তঃ কুরআনের আয়াতের অনুবাদ ইসলামী ইতিহাস ও সঠিক ঘটনা পঞ্জীতে পূর্ণ প্রকাশিত এবং প্রত্যেক সূরার শানে নজুল ও মৌলিক বিষয় অতি সুন্দরভাবে বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গিতে বর্ণিত তৃতীয়তঃ তিনি কুরআনের প্রকাশনা ও ছাপার স্বত্ত্ব সংরক্ষিত রাখেননি। যার ফলে সারা বিশ্বের শত শত প্রকাশক তাঁর লিখিত তাফসীর প্রকাশ করতে ও ছাপাতে আইনতঃ কোন বাধানিষেধের সম্মুখীন হননি।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, যে ব্যক্তির এত যশ ও খ্যাতি, এত সম্মান ও মর্যাদা শেষ জীবনে তাঁকেই নিঃসঙ্গ ফকিরের মত লন্ডন শহরে সড়কের পাশে ছিন্ন মূল জীবন যাপন করতে হয়।

বইয়ের লেখক বলেন, আল্লামা ইউসুফ আলী কুরআনের তরজমা ও তাফসীরর মত বিরাট ও মহান দায়িত্ব শুধু একাই নিজেই বহন করেন। তিনি কোন প্রতিষ্ঠান বা কোন ব্যক্তির সাহায্য বা সহযোগিতা নেননি কিংবা পাননি। তিনি শুধু নিজের জ্ঞান সাধনায় ও দ্বীনের খেদমতের অনুপ্রেরনায় এই বিরাট অর্থবহুল পরিকল্পনা গ্রহণ করে সম্পূর্ণ বন্ধুহীন ও সহযোগীহীন ভাবে কাজ শুরু করেন। তিনি ইচ্ছা করলে অন্যের আর্থিক সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ করতে পারতেন। কিন্তু এত বড় কঠিন কাজ ও অর্থবহুল প্রচেষ্টা নিজে একাকীই চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নেন।

কুরআন মজীদের তরজমা এবং তাঁর বিশ্বনন্দিত ব্যক্তিত্বের উপর ১৯৫৪ সালে তাঁর প্রশংসা ও আলোচনা Who's Who ইংরেজী জার্নালে স্থান পায়। কিন্তু তিনি এই কার্য সমাধা করতে যে অসুবিধার সম্মুখীন হন তাতে তিনি একদম নিঃস্ব ও দেউলিয়া হয়ে পড়েন। তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন

পূর্বে লন্ডনে পাকিস্তানের হাই কমিশনার তৎকালিন পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রীর নিকট একটি পত্র লিখেন। পত্রে আল্লামা আব্দুল্লাহ ইউসুফ আলীর বিষয়ে উল্লেখ করা হয় যে, তাঁকে এখন ছিন্ন বস্ত্রে ও জীর্ণ পোষাকে একটি সুটকেসের উপর ট্রাফালগার স্কোয়ারের পাশে বসে থাকতে দেখেছি। তাঁর পকেটে একটি পয়সাও নেই। তাই তাঁকে এখন লন্ডনের কাউন্টি কাউন্সিল মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনের কাঙালী আশ্রমে রাখা হয়েছে এবং তাঁর সম্পর্কে আমাদের হাই কমিশনে খবর পাঠিয়েছে'।

লেখক ব্যক্ত করেছেন যে, ১৯৫৩ সালের কঠিন শীতের মওসুম তাঁর স্বাস্থ্য ও অবস্থার এমনি অবনতি হয়েছিল যে, বেঁচে থাকাই দায়। ৯ই ডিসেম্বরের খবরে জানা গেল যে, একজন অজ্ঞাত নামা বৃদ্ধ খুবই অস্থির আবস্থায় ওয়েষ্ট মিনিষ্টারের একটি গৃহের দ্বারের সিড়িতে বসা অবস্থায় পাওয়া গেছে। পুলিশ তাঁকে ওয়েষ্ট মিনিষ্টার হাসপাতালে নিয়ে গেছে এবং পরের দিন হাসপাতাল থেকে তাঁকে ছুটি দিয়ে দিয়েছে। অতঃপর ডুহোয়াইট ষ্ট্রীটে বৃদ্ধদের জন্য তৈরী লন্ডন কাউন্সিলের একটি গৃহে রাখা হয়। ১০ই ডিসেম্বর সেই অজ্ঞাত নামা ব্যক্তি হৃদরোগে আক্রান্ত হন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে কুল হিমের সেন্ট স্টিফেন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হাসপাতালে পৌঁছার তিন ঘন্টা পর রোগী মৃত্যু বরণ করেন। (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)।

মৃতদেহ গ্রহণ করা ও তার দাফনের জন্য কোন বন্ধু বা আত্মীয়-স্বজন কেউ হাসপাতালে আসেনি। বাধ্য হয়ে পাকিস্তান হাই কমিশনকে জানানো হয়। তখন তারা হাসপাতালে এসে লাশ নিয়ে ব্রুকওয়ার্ড কবরস্তানের একদিকে যেখানে মুসলমানদের জন্য নির্ধারিত ছিল সেখানে দাফন করার ব্যবস্থা করে।

আল্লামা আব্দুল্লাহ ইউসুফ আলীর মত খ্যাতিমান পন্ডিতের বেদনাদায়ক মৃত্যু অত্যন্ত হৃদয় বিদারক ঘটনা। ইহা একটি করুণ ও শিক্ষনীয় ব্যাপার যে, মুসলিম জাতি এমন রত্ন ও আধাঁরের প্রদীপ ব্যক্তিত্বের কোন সম্মান দিতে পারলোনা, তাঁর দারিদ্রের বিড়ম্বনাকে জাতি নীরবে দেখলো। আফসোস! শত আফসোস! (আরব নিউজ ইংরেজী)। *সৌজন্যে- তরজুমান, দিল্লী।*

মহিলাদের পাতা

নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ইসলাম

-তাহেরুন নেসা

সভ্যতার চরম বিকাশের যুগেও নারীর যে অমর্যাদা ও অবমূল্যায়ন দেখা যাচ্ছে, তা আরবের আইয়্যামের জাহেলিয়াতের যুগকেও ছাড়িয়ে গেছে। শুধু এদেশেই নয়, পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই নারী জাতি এক অসহনীয় মর্যাদাহীন পরিস্থিতির শিকার। নির্যাতন, নারী পাচার, ধর্ষণ, অপহরণ, এসিড নিক্ষেপ, যৌতুকের বিভৎস অত্যাচার প্রভৃতি নিত্যকার ঘটনা আমাদের আতঙ্কগ্রস্থ করে তুলেছে। অপ্রাপ্ত বয়স্কা কিশোরী, হাসপাতালের অসুস্থ রোগিনী এমনকি মৃতা লাশ পর্যন্ত পাশবিকতার হিংস্র থাবা থেকে রেহাই পাচ্ছে না। নারী কর্তৃক নারী নির্যাতনের ঘটনাও এ সমাজে ঘটছে।

বিগত যুগেও নারী জাতি এমনিভাবে বিভিন্ন অজুহাতে ও কলা-কৌশলে নির্যাতিত হয়েছে। সে যুগের সমাজ নেতারা এর প্রতিরোধে কিছু কিছু

চেষ্টাও নিয়েছিলেন- যা প্রায় সকল যুগেই ব্যর্থ হয়েছে। এ ব্যাপারে বিগত সভ্যতাগুলিতে নারীর দেওয়া মর্যাদার সাথে ইসলামের দেওয়া মর্যাদাকে আমরা তুলনামুলক অলোচনার মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা পাব।

১. গ্রীক যুগে নারীঃ প্রাচীন সভ্যতা সমূহের মধ্যে গ্রীক সভ্যতা ছিল সবচেয়ে নামকরা। জ্ঞান-বিজ্ঞানে ও চিকিৎসা শাস্ত্রে তারা তৎকালীন পৃথিবীর নেতৃত্ব দিত। কিন্তু নারীর মর্যাদা সেখানে ছিল খুবই দূর্ভাগ্যজনক। গ্রীকদের ধর্মীয় গ্রন্থসমূহে নারীকে 'মানুষের দুঃখ কষ্টের মূল কারণ' হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এই নোংরা আকীদা তাদের নৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল। ফলে কিছু সংখ্যক ব্যতিক্রম বাদে অধিকাংশ গ্রীক নাগরিকের নিকটে নারীর মর্যাদা ছিল ভূলুণ্ঠিত। অধিকাংশের নিকটে বিয়ে একটি বোঝা স্বরূপ গণ্য হয়েছিল। নারীদের প্রতি সমাজের দায়িত্ব অতটকুই ছিল যেমন পতিতালয়ের নারীদের প্রতি সমাজের দায়িত্ব। পতনযুগে গ্রীকরা 'আফ্রোদিত' (APHRODITE) নামক প্রেম দেবীর পূঁজা শুরু করে। ফলে বেশ্যালয়গুলি উপসনা কেন্দ্রের ন্যায় উঁচু-নীচু সকলের জন্য সম্মেলন কেন্দ্রে পরিণত হয়। এভাবে নারীত্বের অবমাননার সাথে সাথে গ্রীক সভ্যতার মৃত্যুঘন্টা বেজে ওঠে।

২. রোমক সভ্যতায় নারীঃ গ্রীকদের পরেই ইতিহাসে রোমান সভ্যতার স্থান। তাদের উন্নতির যুগে নারীর সতীত্ব ও সম্মানকে খুবই মর্যাদার চোখে দেখা হ'ত। সেখানে বিবাহ ও পর্দাপ্রথা চালু ছিল। বেশ্যাবৃত্তি চালু থাকলেও লোকেরা এটাকে খুবই ঘৃণা করত।

কিন্তু বস্তুগত উন্নতির চরম শিখরে উঠে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পালটে যায় এবং নারীদেরকে ঘরের নিরাপদ আশ্রয় থেকে স্বাধীনতার নামে বের করে নিয়ে আসে। পুরুষের সঙ্গে পাশাপাশি তাদেরকে কর্মজগতে নামিয়ে দেওয়া হয়। ফলে বৈবাহিক জীবনে নেমে আসে চরম স্বেচ্ছাচার। দাম্পত্য বন্ধন শিথিল হ'তে থাকে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অবিশ্বাস দানা বাঁধতে থাকে। বিচ্ছেদের সংখ্যা ভায়াবহভাবে বাড়তে থাকে। বিবাহ এক সময় সামাজিক চুক্তির রূপ ধারণ করে। যা যে কোন সময় ভঙ্গ করা চলে। স্ত্রীরা যে কোন সময় চুক্তি বাতিল করে অন্য ব্যক্তির সঙ্গে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিবাহের চুক্তি করতে শুরু করে। পাদ্রী জুরুম (৩৪০-৪২০ খ্রীঃ) বিগত যুগের একজন নারীর কথা বলেন, যে ৩২ জন পুরুষের সঙ্গে বিবাহের চুক্তি করেছে এবং সে তার শেষ স্বামীর ২১তম স্ত্রী ছিল। সমাজের নেতারা এইসব বিয়েকে 'ভদ্র যেনা' গণ্য করতেন। রোম সামাজের নৈতিকতা বিষয়ক ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল কাতো (CATO) (মৃঃ ১৮৪ খৃঃ পূ) বিষয়টি স্বীকার করেন এবং সমাজে স্বেচ্ছাচারমূলক বহু বিবাহ প্রথাকে 'মন্দ কাজ নয়' বলে মন্তব্য করেন। এইভাবে যেনার ছড়াছড়িতে রোমকদের নৈতিক মেরুদন্ড ভেঙ্গে যায়- যা তাদের সভ্যতার পতন ডেকে আনে।

৩.ইউরোপীয় খৃষ্টানদের নিকটে নারীঃ রোমকদের পতনের পর ঈসায়ী ধর্ম ইউরোপীয়দের নিকট প্রসার লাভ করে। রোমকদের পতন দশা তাদের উপরে দারুণ প্রভাব ফেলে। সেকারণ তারা নারী সঙ্গ ত্যাগের সিদ্ধান্ত নেয়। পাদ্রীরা ঈসায়ী ধর্মের মুখপাত্রের দাবী নিয়ে ঘোষণা করেন যে, নারী হ'ল 'সকল পাপের উৎস' এবং মানব জাতির অভিশাপ। তারতুলিয়ান (TERTULLIAN) ক্রিসোসতাম (CHRYSOSTUM) প্রমুখ

পাদ্রীনেতারা এই ঘোষণা দিয়ে বিয়েকে যদিও হালাল রাখেন, তথাপি এটাকে 'বিধিবন্ধ যেনা' হিসাবে নিন্দনীয় মনে করেন।

খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকে প্রচারিত এই চরমপন্থী মতবাদ সমস্ত খৃষ্টান জগতকে আচ্ছন্ন করে ফেলে এবং নারীর প্রায় সকল অধিকার হরণ করে। ১৮শ শতাব্দীতে ফরাসী বিপ্লব পর্যন্ত এই অবস্থা কমবেশী চালু থাকে। কিন্তু এই চরমপন্থী ব্যবস্থা বেশী দিন টেকেনি। ১৯শ শতব্দীতে এসে আবার আমূল পরিবর্তন ঘটে এবং নারী স্বাধীনতার পক্ষে তারা পাল্টা চরমপন্থী কিছু নীতি চালু করে। যেখানে নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমতা বিধান নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা চালানো হয়। কিন্তু উভয় নীতিই ছিল চরমপন্থী এবং মানুষের স্বাভাবধর্ম বিরোধী। ফলে পূর্বেকার বিধ্বস্ত সভ্যতাগুলির ন্যায় খৃষ্টানী সভ্যতাও যৌন স্বেচ্ছাচারে ধ্বংসের পথে দ্রুত এগিয়ে গেল। আধুনিক প্রযুক্তি তাদেরকে এ ব্যাপারে আর উৎসাহ যোগাচ্ছে। গর্ভপাত সেখানে আইনসিদ্ধ হয়েছে। কুমারী মাতা এখন আর কোন লজ্জার ব্যাপার নয়। 'কলগাল' সে দেশের সভ্যতার অংশ। তাদের সাহিত্য যৌনতায় ভরে গেছে। নগ্নতা এখন সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়েছে। বল্গাহীন নারী স্বাধীনতা প্রকারান্তরে নারীত্বের অমর্যাদার শামিল। তাই বলা চলে যে, বর্তমানের খৃষ্টানী বা আধুনিক সভ্যতা তাদের পূর্বসূরী রোমক ও গ্রীকদের ন্যায় ক্রমেই ধ্বংসের প্রক্রিয়ায় এগিয়ে চলেছে।

৪. কম্যুনিষ্ট ও সমাজতন্ত্রী বিশ্বে নারীর মর্যাদাঃ বর্তমান যুগে কম্যুনিষ্ট বিশ্বে যে সামাজিক ব্যবস্থা চালু হয়েছে, তা মূলতঃ ইরানের প্রাচীন 'মাযদাকী' মতবাদেরই প্রতিধ্বনি মাত্র। বাদশাহ নওশেরওয়া এর পিতা কোবাদ এর আমলে " মাযদাক" নামক জনৈক চিন্তাবিদ মত প্রকাশ করেন যে, মানব সমাজে সকল অশান্তির মূল কারণ হ'ল নারী ও অর্থ-সম্পদ। অতএব এই দু'টি বস্তু ব্যক্তি মালিকানা থেকে বরে করে জাতীয় মালিকানায় থাকতে হবে। আগুন, পানি ও মাটিতে যেমন সকলের অধিকার আছে, নারী ও সম্পদেও তেমনি সকলের সমানাধিকার থাকবে। বর্তমান সমাজতন্ত্রী বিশ্বে সম্পদ জাতীয়করণ করা হয়েছে। নারীর অবস্থা সেখানে মাযদাকী আমলের চেয়ে খুব একটা পৃথক নয়। বিবাহ প্রথাটি যদিও সেখানে চালু আছে, তবুও ঘুনে ধরা কাঠের মতই ক্ষণভঙ্গুর। ফলে নারীর মর্যাদা সেখানে ক্রমেই ভোগ্যপণ্যের অবস্থায় উপনীত হচ্ছে।

৫. ইহুদী, ব্যবিলনীয়, পরিসিক ও হিন্দু সভ্যতায় নারীঃ ইহুদীদের ধারণামতে মা 'হাওয়া' ছিলেন 'মানব জাতির সকল দুঃখ-কষ্টের মূল'। এই ভুল ধারণাই ইহুদী সমাজ জীবনের সর্বত্র পরিব্যপ্ত। ফলে তাদের সমাজে নারীর মর্যাদা বলতে তেমন কিছুই ছিল না।

গ্রীক সভ্যতার চরম অধঃপতন যুগে ব্যবিলনীয় ও পারসিক সভ্যতায় ব্যাপক ধ্বস নামে। ব্যবিলনীয়দের মধ্যে ব্যভিচার সাধারণ রূপ ধারণ করে। পারসিকদের মধ্যে মাযদাকী মতবাদের প্রসার ঘটে। একই সময়ে হিন্দুদের মধ্যে 'বামমার্গী' নামক চরম নোংরা ধর্মীয় মতবাদ চালু হয়। যেখানে নারীরা পরকালীন মুক্তির ধোকায় পড়ে নিজেরা এসে ঐসব বামমার্গী সাধুদের বাড়ীতে ও মন্দিরে দেহদানে লিপ্ত হ'ত। হিন্দুদের নিকট গ্রীকদের ন্যায় নারীরা 'পাপাত্মা' বলে কথিত ছিল। সেকারণ তাদেরকে সম্পত্তির অধিকার, বিধবা বিবাহের অধিকার ইত্যাদি থেকে বঞ্চিত

করা হয়। এমনকি স্বামীহারা নারীকে ধর্মের নামে মৃত স্বামীর চিতায় জীবন্ত পুড়িয়ে মারার বিধানও চালু করা হয়। যা 'সতীদাহ প্রথা' নামে পরিচিত। নারীদের জন্য শিক্ষা গ্রহণ ও ধর্মগ্রন্থ স্পর্শ নিষিদ্ধ করা হয়। গান্ধর্ব্য বিবাহ, রাক্ষস বিবাহ, শিবলিঙ্গ পুজা প্রভৃতির মাধ্যমে তারা নারীকে স্রেফ ভোগের সামগ্রী হিসাবে ব্যবহার করে। যা কমবেশী আজও চালু আছে।

৬. প্রাক ইসলামী যুগে আরবদের নিকটে নারীঃ ইসলাম আসার প্রাক্কালে আরবীয় মহিলা সমাজে দু'টি স্তর ছিল। (ক) উচ্চস্তরের মহিলাঃ এরা ছিলেন কবিতা, বীরত্ব, চিকিৎসা, বক্তৃতা ও জ্ঞানবত্তার দিক দিয়ে সকলের নিকটে শ্রদ্ধার পাত্রী। মা খাদীজা এই স্তরেরই একজন স্বনামধন্যা বিদুষী মহিলা ছিলেন। (খ) সাধারণ স্তরের মহিলাঃ এই স্তরে মহিলারাই ছিলেন সমাজে সংখ্যাগরিষ্ট। তাদের অবস্থা বিগত পতিত সভ্যতা গুলির চাইতে বরং কোন কোন ক্ষেত্রে আর অধঃপতিত ছিল। যার জন্য কণ্যাসন্তানের জন্ম হওয়া বাপ-মায়ের নিকট খুবই দুঃখের কারণ হিসাবে প্রতীয়মান হ'ত। অনেকে এজন্য কন্যা জন্মের সাথে সাথে মাটিতে পুঁতে বা কুয়ায় ফেলে মেরে ফেল্‌ত। (সূরায়ে নাহল ৫৮, তাকভীর ৮,৯) সামাজে মেয়েদের কোন অধিকার স্বীকৃত ছিল না। বিবাহ, তালাক, সম্পত্তির অধিকার সবই ছিল পুরুষের একচেটিয়া। ঠিকা বিবাহ, বহু বিবাহ, বদলী বিবাহ, মা ব্যতীত অন্যান্য সকল মহিলা বিবাহ প্রভৃতি নোংরামি চালু ছিল। অধিকাংশ নারীই সমাজে অধিকারহীন ক্রীতদাসী হিসাবে ব্যবহৃত হ'ত। যেনা- ব্যভিচার ব্যাপকহারে চালু ছিল। ফলে সাধারণভাবে নারী ভোগের সামগ্রী হিসাবেই ব্যবহৃত হ'ত। (ক্রমশঃ)

কবিতা

আত-তাহরীক

- গুমনাম রাহী

আত-তাহরীক! তাওহীদী জনতার কণ্ঠস্বর।
তোমার প্রতীক্ষায়, প্রতি উষা লগ্নে জেগে,
তোরণে তোরণে সুসজ্জিত, খোশ আমদেদ।
তোমার ভাষা মাহবুবে ইলাহীর সুরে সুরে
বিশ্ব মানবের মুক্তির বারতা ও জাগরণের
জোয়ারে উত্তাল তরঙ্গের কল্লোল ধ্বনি।
তুমি এসেছ দুয়ারে, তাই বরণের পালা।
লও মোদের সুবজ ও রক্তিম সালাম।
বলতো, এ কোন্ যুগ, বিশ্ব পরে ?
প্রলয়ের আভা ঐ আকাশের কোনে
পশ্চিম দিগন্তের আকাশগুলো লাল!
হয়ত অগ্নিঝরা আনবিক বিস্ফোরণ!
উত্তরে শ্বেত ভল্লুকের হামলার আশংকা ক্ষীণ
তবুও আতংক চারিদিকে পার্শ্বে, পশ্চাতে
ও গৃহকোনে! কোন আবরণে ঢাকা বিষধর-
ঈগলের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি তব নয়ন যুগলে
নিদ্রা ও তন্দ্রার কোন আবকাশ নেই!
বিনিদ্র রজনী জেগে অতন্দ্র প্রহরীর মত
প্রহরার সতর্কতায় বেদীন থমকে দাঁড়ায়,
বলে মুসলিম! ঘুমোওনি এখনও ?
এত মদ, মতবাদ, অফিস, হিরোইন ও ড্রাগ
সব কি শেষে বিফলে গেল?
ঐ যে সদা জাগ্রত প্রহরায় রত একটি দল,
কল্যাণের আহবানে অকল্যাণে বাধা দানে
ব্যস্ত যারা, তুমি তাদের কণ্ঠস্বর, আযান ধ্বনি!
ঘুমন্ত উম্মত জাগো! ঐ শোন জাগার আহবান।
'আছ্ছালাতু খায়রুম মিনান নাউম'!
ঘোর আঁধারের মাঝে পূবে প্রভাতের আলো।
উষার ছালাত শেষে চেয়ে দেখো কওম!
চেয়ে দেখো উম্মত সর্বহারা!
আত-তাহরীক!
তোমার আন্দোলনের সুরে পুণঃ জাগবে এরা।।

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-১ঃ যোহর ও আছরের ছালাতের শেষ দু''রাক'আতে সূরায়ে ফাতিহার সাথে অন্য কোন সূরা মিলাতে হবে কি?

মুহাম্মাদ খায়রুল আনাম খাঁ
সাং কাটাখালি
পোঃ ইসলামকাঠি
থানাঃ তালা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ প্রথম দু'রাক'আতে মিলাতে হবে, শেষ দুরাক'আতে নয়। দলীলঃ

عن ابي قتادة أن النبي (ص) كان يقرأ في الظهر في الأُلَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وسورتين وفي الركعتين الأُخْرَيَيْنِ بفاتحة الكتاب و يُسْمِعُنَا الاية أحياناً ويَطُوْلُ في الركعة الاولى مالا يُطِيْلُ في الثانية وهكذا في العصر وهكذا في الصبح (متفق عليه و ابوداؤد)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে একটি রেওয়ায়াত এর বিপক্ষে থাক্লেও অন্য রেওয়ায়াতে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করে বলেন,

لاأدْرِيْ أكانَ رسولُ اللّه (ص) يَقْرَأُ في الظُّهْرِ والْعَصْرِ أم لا- (ابوداؤد)

উছূলে হাদীছের নিয়মানুযায়ী إثبات এর বর্ণনা نفي এর উপরে অগ্রগণ্য বিধায় বুখারী ও মুসলিম বর্ণিত إثبات এর নির্দেশ অগ্রগণ্য হবে। ইমাম শওকানী বলেন, উক্ত হাদীছ দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, সকল প্রকার ছালাতে সূরায়ে ফাতিহা পড়তে হবে এবং প্রথম দিককার রাক'আত শেষের দিকের রাক'আত অপেক্ষা দীর্ঘ হবে (নায়লুল আওত্বার ২/২৫২)।

প্রশ্ন-২ঃ (এক) নির্ধারিত সময় উত্তীর্ণ হ'য়ে গেলেও নির্ধারিত ইমাম ছাহেবের জন্য অপেক্ষা করা যাবে কি ?

মুহাম্মাদ নওশাদ আলী (৩৫)
পিতাঃ মুহাম্মাদ ওমর আলী
সাং শিবপুর, জায়গীর পাড়া
পোঃ শিবপুর, থানাঃ পুঠিয়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ অপেক্ষা করা যাবে। তবে ওয়াক্ত উত্তীর্ণ হ'য়ে যাওয়ার মত সময় ব্যয় করা যাবেনা। জামা'আতী শৃংখলা রক্ষার স্বার্থে ইমাম ছাহেবকেও যথা সম্ভব সময়ের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। দলীলঃ ١- إنّما جُعِلَ الامامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ رواه البخاري- বুখারী, মিশ,হা/ ১১৩৯;

٢- فقال أَصَلَّي الناس فقلنا لا يارسولَ اللّهِ وهُمْ يَنْتَظِرُوْنَكَ فقالَ ضَعُوْا لِيْ مَاءً (متفق عليه- مشكاة ح/ ١١٤٧) (বুখারী ও মুসলিম, মিশ হা/ ১১৪৭

প্রশ্ন-৩ঃ (দুই) মাগরিরের পূর্বে দু'রাক'আত সুন্নাত পড়া যাবে কি-না ?

উত্তরঃ পড়া উচিত। দলীলঃ-

١- بَيْنَ كُلِّ أذَانَيْنِ صَلاةٌ ، بين كل اذانين صلاة ثم قال في الثالثة لمَنْ شَآءَ - متفق عليه ، مشكاة ح/ ٦٦٢ (বুখারী ও মুসলিম, মিশ হা/ ৬৬২

٢- صَلُّوْا قَبْلَ صَلاةِ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ ،صلّوا قبل صلاة المغرب ركعتين قال في الثالثة لِمَنْ شَآءَ كِرَاهِيَةً أنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً (اي موكّدة) متفق عليه - روى الحديثين عبد الله بن مغفل (رض) مشكاة ح/ ١١٦٥ باب السنن وفضائلها- (বুখারী ও মুসলিম, মিশ হা/ ১১৬৫

উক্ত সুন্নতটি আদায় করলে তিনটি নেকী পাওয়া যায় (১) নিজের জন্য দুই রাক'আত ছালাতের নেকী (২) অধিক সংখ্যক মুছল্লীর জামা'আতে শরীক হওয়ার সুযোগ দানের নেকী (৩) একটি মোর্দা সুন্নত যেন্দা করার নেকী।